বুলেটিন নং: ২০
বর্ষ ৮ ॥ সংখ্যা ১
প্রকাশ কাল: ১০ এপ্রিল ২০০২
শুভেচ্ছা মূল্য: ৳ ৫ ॥ $2

THE SWADHIKAR
স্বাধিকার

স্বাধিকার কিনুন
স্বাধিকার পড়ুন
আন্দোলনে সামিল হোন

ইউনাইটেড পিপল্‌স ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ) -এর মুখপত্র

বৈসাবিতে আহ্বান: সংঘাত-হানাহানি নয়, আসুন ঐক্যবদ্ধ হই

॥ বিশেষ রচনা ॥ ঋতুচক্রের আবর্তনে আমাদের মাঝে মহান ঐতিহ্যবাহী উৎসব বৈসাবি (বৈসু-সাংগ্রাই-বিঝু) সমাগত। বছরের এই একটি দিন অন্তত কমবেশী সবাই শত দুঃখ-কষ্ট,অভাব-অনটন, নিদারুণ যন্ত্রণা ভুলে কিছুটা হলেও আনন্দ উৎসবে শরীক হতে চায়। একত্রিত হয় এদিনে বন্ধু পরিজন পরিবারের সদস্যরা যে যেখানেই থাকুক। বছরের সমস্ত দুঃখ-গ্লানি আর ব্যর্থতার জঞ্জাল পুড়িয়ে, সব লেনা-দেনা মিটিয়ে, মানুষ শুরু করতে চায় নব উদ্যমে পথ চলা। আগামী দিনের স্বপ্ন ও সোনালী সম্ভাবনা আর নতুন সাফল্যের আশায় বুক বেঁধে সম্মুখপাণে পথ চলতে চায়। বিগত দিনের ব্যর্থতা আর নিষ্ফল সঞ্চয়কে পেছনে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে, অর্জিত সাফল্যকে পুঁজি করে আরো অধিকতর উন্নতি ও আরো সমৃদ্ধির লক্ষে এগুতে চায় সম্মুখে।

আবহমান কাল ধরে এগিয়ে চলার এই দুর্বার আকাঙ্ক্ষা মানুষকে তাড়িত করেছে। অধিকারহারা জনগণ তাই লড়াই করছে অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে। নির্যাতিত নিপীড়িত জাতি সংগ্রাম করছে নির্যাতন নিপীড়ন থেকে মুক্তির আশায়। শোষিত বঞ্চিত জাতি লড়াই করছে শোষণ ও বঞ্চনা থেকে মুক্তি পেতে। দুনিয়ার দেশে দেশে চলছে এ লড়াই সংগ্রাম। যেখানে নিপীড়ন নির্যাতন সেখানেই প্রতিবাদ প্রতিরোধ। যেখানে শোষণ বঞ্চণা সেখানেই লড়াই সংগ্রাম অনিবার্য।

বাংলাদেশের এক প্রান্তে পার্বত্য চট্টগ্রাম নামের ভূ-খন্ডের জনগণও তার ব্যতিক্রম নয়। এ অঞ্চলের জনতা নিপীড়ন নির্যাতনের প্রতিবাদ প্রতিরোধ করেছে। সত্তর দশকের দিকে ছিলো জনসংহতি সমিতি। তখন জেএসএস অধিকার প্রতিষ্ঠার কথা বলতো। জনগণ মন-প্রাণ সঁপে দিয়ে সে সময়ে আন্দোলন সংগ্রামে সহায়তা দিয়েছে। নিজের জীবন বিপন্ন করে তাদের দু'মুঠো খাবার যুগিয়েছে। আশ্রয় দিয়েছে। আগলে রাখে বিপদ-আপদ থেকে তাদের। সমস্ত দুঃখ-কষ্ট নিপীড়ন নির্যাতন মুখ বুঁজে সহ্য করেছে, একটি মাত্র স্বপ্নকে লালন করে। সে স্বপ্ন হচ্ছে, একদিন এদেশে অভাগা দুঃখী মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে। সকল দুঃখ-যন্ত্রণা আর লাঞ্চনা বঞ্চনার অবসান হবে। জাতিসত্তার স্বীকৃতি মিলবে। প্রকৃত নাগরিকের মর্যাদা ও সম্মান প্রতিষ্ঠিত হবে। ফিরে পাওয়া যাবে হারানো জমি। বিচার হবে সমস্ত হত্যাযজ্ঞের। লেঃ ফেরদৌসসহ সকল চিহ্নিত খুনী অপরাধীদের শাস্তি হবে।সাধারণ নিরীহ লোকজনকে আর অপদস্থ হতে হবে না আর্মি-বিডিআর'এর চেক্ পোষ্টে কিংবা ক্যাম্পে। তরুণ যুবকদের আর খুন-গুম হতে হবে না। কোন মা-বোনকে আর স্বামীহারা সন্তানহারা হতে হবে না। ইজ্জত হারাতে হবে না আর কোন যুবতী বা কিশোরীকে। পিতৃ-মাতৃহারা হয়ে অনাথ হতে হবে না পার্বত্য চট্টগ্রামের আর কোন শিশুকে।

বিতর্কীত 'পার্বত্য চুক্তি' পাঁচ পাঁচটি বছর হতে চলেছে। বছর ঘুরে বৈসাবি আসে, বৈসাবি গত হয়। কিন্তু দুঃখীনী পাহাড়ি মায়ের জীবনে দুঃখ যেন ঘুচে না। হয় না আশা পূরণ, কান্না আর থামে না। বাবুছড়া বাজারে প্রকাশ্য দিবালোকে কিশোরী সেনাসদস্যদের হাতে লাঞ্ছিত হয়। তার প্রতিবাদে ইউপিডিএফ সমাবেশ ডাকলে জেএসএসও একই সময়ে একই স্থানে সমাবেশ ডেকে তা ভুন্ডুল করে দেয়। ইউপিডিএফ কর্মিদের পুলিশ নিয়ে ধাওয়া করে। কসুমপ্রিয়-প্রদীপ লাল,হরেন্দ্র-হুরুক্যা, মৃণাল-আনন্দ, দেবোত্তম, মংশে, রূপক সহ আরো বহু সম্ভাবনাময়ী যুবক তাদের হাতে খুন হয়। বহু যুবক ঘরছাড়া এলাকাছাড়া। দুঃখীনী মায়ের ছেলে বাড়ী ফিরতে পারে না আজো, যদিও 'পার্বত্য চুক্তি' করে এক অংশ ফিরেছে। এক অজানা আশঙ্কায় দুঃখীনী মা ছেলের পাণে পথ চেয়ে থাকে।

কি চেয়েছিলো পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণ? বিনিময়ে কি পেলো তারা? 'পার্বত্য চুক্তির' ফলে কি-ই বা অর্জিত হয়েছে? চৌদ্দ শ' নয় সালের বাংলা বর্ষের শেষ পাদে, নতুন বছরের সূচনা লগ্নে আবারো এ প্রশ্নগুলো জনমনে আরো বড় করে দেখা দিয়েছে। জনগণ আর আগের মতো বোবা সেজে থাকতে প্রস্তুত নয়, তারা এসব প্রশ্নের উত্তর চায়। নিজেদের ন্যায্য পাওনার হিসেব চায় কড়ায়-গন্ডায়। ব্যক্তি বিশেষের কারোর মন্ত্রীত্ব, প্রতিমন্ত্রীত্ব, আঞ্চলিক পরিষদ, জেলা পরিষদ, শরণার্থী টাস্ক ফোর্স কমিটি বা উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান পদের গদি লাভ মানে পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যার সমাধান হয়ে যাওয়া নয়। সেটা আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে যেমন সত্য ছিলো, বর্তমান বিএনপি নেতৃত্বাধীন চার দলীয় জোট সরকারের আমলে তার সত্যতা সবার সামনে আরো বেশী পরিষ্কার হয়ে উঠেছে। সব সরকারের আমলেই পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে কাউকে না কাউকে মন্ত্রি, প্রতিমন্ত্রী, উপমন্ত্রী, উপদেষ্টা বা কোন না কোন পদে বসানো হয়েছিলো,জনগণকে অধিকার দেবার জন্য নয়, সেটা ক্ষমতাসীন সরকারের স্বার্থেই। জিয়া, সাত্তার, এরশাদ, খালেদা, হাসিনা সবার সময়ে ঐ পলিশি ছিলো। পাকিস্তান আমলেও তার ব্যতিক্রম ছিলো না। ক্ষমতাসীন দলের সাথে উঠা-বসার সুবাদে কিছু ব্যক্তির ব্যবসা, টিকাদারী, সুযোগ সুবিধা, চাকরী-বাকরী পাওয়া আর পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠা হয়ে যাওয়া এক কথা নয়। এই জায়গাতেই অনেকের মোহ আর বিভ্রান্তি রয়েছে। সরকার পরিবর্তনের সাথে সাথে কিছু লোককে মন্ত্রি, উপদেষ্টা, কোন সংস্থার চেয়ারম্যান-মেম্বার কিংবা কিছু লোককে বৈষয়িক সুযোগ-সুবিধা পাইয়ে দেবার জন্য অর্ধ লক্ষাধিক লোক ভারতে শরণার্থী হয়নি, পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণ কিছু লোকের ক্ষমতা ও স্বার্থ রক্ষার জন্য আন্দোলন সংগ্রাম করছে না-- এ বিষয়টি সবার কাছে দিবালোকের মতো পরিষ্কার হওয়া দরকার। ক্ষমতাসীন দলের সাথে দেন-দরবার করে পেছনের দরজা দিয়ে মন্ত্রিত্ব কিংবা নানান সুযোগ-সুবিধা হাতিয়ে নেয়া যায়। কিন্তু সেভাবে জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠা করা যায় না। অধিকার আদায় করে নিতে হয় আন্দোলনের মাধ্যমে। ষড়যন্ত্র বা চক্রান্ত করে দুনিয়ার কোথাও অধিকারহারা জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠা হয়নি। ঠিক এ জায়গাতেই জেএসএস বড় ধরনের রাজনৈতিক ভুল করে বসেছে। আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় থাকার সময়, অন্য কারোর মতামত তোয়াক্কা না করে, অত্যন্ত তড়িঘড়ি করে তারা 'লিখিত-অলিখিত' চুক্তি করে বসে। আওয়ামী লীগকে দেশের পাহাড়িদের একমাত্র সহানুভূতিশীল দল বলে স্বীকৃতি দেয়। 'হাসিনার প্রতি গভীর অগাধ আস্থা বিশ্বাস স্থাপন' করে বসে। আর সে সময় আওয়ামী লীগের ফাঁদে পা না দেবার জন্য তিন গণতান্ত্রিক সংগঠন পিসিপি-পিজিপি-এইচডব্লিউএফ সতর্কমূলক বক্তব্য বিবৃতি দিলে, সন্তু লারমা ক্ষেপে উঠেন। চুক্তি বিরোধীতাকারীদের হাত-পা ভেঙে দিতে, গলা টিপে হত্যা করতে নির্দেশ দেন। চুক্তির সমালোচনা করলে তাতে বিএনপি-জামাতের সংযোগ খুঁজে পান। পরিহাস হচ্ছে যে, বর্তমান বিএনপি সরকারের সাথেও নির্বাচনের আগে জেএসএস মৌখিক সমঝোতা করেছে।পার্বত্য চট্টগ্রামের কর্ণফুলী-চেঙ্গী-মাইনি-কাচলং-শঙ্ক-মাতামুহুরি নদীর অনেক জল গড়িয়ে যাবার পর সন্তু লারমা রাঙ্গামাটি টাউন হলে ২৮ ডিসেম্বর প্রকাশ্যে স্বীকার করেছেন যে, আওয়ামী সরকার পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা সমাধানের জন্য চুক্তি করেনি, অস্ত্র ও গোলা বারুদ হাতিয়ে নেবার জন্যই চুক্তি করেছে। সে কথা ইউপিডিএফ বহু আগেই বলেছে। যে সময় জেএসএস-এর সব কিছু ছিলো, তখন জেএসএস এককভাবে জনগণের জন্য বড় কিছু আদায় করতে পারেনি। এখন জেএসএস বহু দুর্বল। তার পক্ষে এককভাবে কিছু অর্জন সম্ভব নয়। চুক্তি বাস্তবায়নের আন্দোলনও তার পক্ষে সম্ভব নয়। এটাই বাস্তবতা। চোখ বুঁজে দিনের আলো অস্বীকার করা মূঢ়তার সামিল হবে। কাজেই আর হানাহানি নয়, আসুন বৈসাবি'তে বৃহত্তর স্বার্থে নিজেদের শক্তি এক করি। ❐

খাগড়াছড়িতে ভারত প্রত্যাগত শরণার্থীদের মিছিল ও প্রধানমন্ত্রী বরাবরে স্মারকলিপি পেশ

স্বাধিকার রিপোর্ট ॥ গত ৪ঠা মার্চ ভারত প্রত্যাগত জুম্ম শরণার্থীরা তাদের বিভিন্ন দাবিতে খাগড়াছড়ি শহরে মিছিলের আয়োজন করে এবং জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী বরাবরে ২২ দফা দাবি সম্বলিত একটি স্মারকলিপি পেশ করে। মিছিলে শত শত জুম্ম শরণার্থী অংশগ্রহণ করেন। প্রত্যাগত শরণার্থীদের পক্ষে স্মারকলিপিতে সই করেন প্রভাকর চাকমা, সন্তোষিত চাকমা বকুল, শান্তিব্রত চাকমা ও ধর্মবীর চাকমা।

স্মারকলিপিতে বলা হয় চুক্তি মোতাবেক স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করলেও বিগত সরকারের আমলে প্রত্যাগত শরণার্থীরা তাদের বেদখল হয়ে যাওয়া জায়গা জমি ফেরত পায়নি। উপরন্তু স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের পর শরণার্থীদের ওপর শারীরিক নির্যাতন, বাড়িঘরে অগ্নিসংযোগ, হত্যা, লুণ্ঠন ও ধর্ষণসহ নানাবিধ অত্যাচার ও নিপীড়ন অব্যাহত রয়েছে। .... এমতাবস্থায় স্বাক্ষরিত চুক্তি মোতাবেক শরণার্থীদের জমিজমা ফেরত দান, জীবনের নিরাপত্তা বিধান, নিজ বাসভূমিতে বসবাসের নিশ্চয়তা বিধান ও মানবিক অধিকার নিয়ে বেঁচে থাকার অধিকার প্রদান অত্যন্ত জরুরী।

উক্ত স্মারকলিপিতে শরণার্থী নেতৃবৃন্দ ২২ দফা দাবি জানান। এগুলো হলো ১. শরণার্থীদের জমির উপর অবৈধ দখলকারীদের উচ্ছেদ করে শরণার্থীদের স্ব স্ব জমি ফেরত প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা। ২. জুম্ম শরণার্থীদের সুষ্ঠু পুনর্বাসন না হওয়া পর্যন্ত রেশন প্রদান অব্যাহত রাখা। ৩. যে সমস্ত পরিবার হালের গরুর টাকা পায়নি সে সমস্ত পরিবারকে হেডম্যানের কাছ থেকে ওয়ারিশ সার্টিফিকেট সাপেক্ষে এক জোড়া হালের গরু ক্রয় বাবদ ১০,০০০ টাকা প্রদান করা। ৪. চুক্তি মোতাবেক সকল ভূমিহীন শরণার্থীদের ভূমি বন্দোবস্তী প্রদান করা। ৫. ২০ দফা প্যাকেজ চুক্তি ও পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি মোতাবেক ভারত প্রত্যাগত শরণার্থীদের কৃষি ঋণ, সরকারী সংস্থা ও অন্যান্য ব্যাংকের ঋণ সুদসহ মওকুফ করা ও আত্মকর্ম সংস্থানমূলক প্রকল্পের জন্য সহজ শর্তে ঋণ প্রদান করা। ৬. জমি সংক্রান্ত হয়রানিমূলক মিথ্যা মামলাসহ চুক্তি মোতাবেক সাধারণ ক্ষমার আওতায় সকল মামলা প্রত্যাহার ও সাজা মওকুফ করা। ৭. বেদখলকৃত ৫টি বৌদ্ধ মন্দির, ২টি হরি মন্দির, ১টি অনাথ আশ্রমের জমিজমা ফেরত প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা ও টাস্ক ফোর্স সভায় জুম্ম শরণার্থী কল্যাণ সমিতি কর্তৃক প্রদত্ত তালিকা ৫২টি মন্দিরের সংস্কার ও পুনঃ নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ করা। ৮. যে সমস্ত শরণার্থীকে এখনো পূর্বতন চাকুরীতে পুনর্বহাল করা হয়নি তাদেরকে অবিলম্বে চাকুরীতে পুনর্বহাল করা এবং পুনর্বহালকৃত শরণার্থী চাকুরীজীবীদের জ্যোষ্ঠতাসহ অন্যান্য আর্থিক সুবিধাদি প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা। ৯. স্বেচ্ছায় (স্বউদ্যোগে) প্রত্যাগত ও ১৯৯৪ সনে দু পর্যায়ে প্রত্যাগত ১৭৯৫ টি শরণার্থী পরিবারের জন্য কাঠের পারমিটের পরিবর্তে ৩০০০ টাকা প্রদান করা। ১০. তালিকা বহির্ভূত ১২০৮ পরিবার শরণার্থীর মধ্যে ৫৫ পরিবার ৬ মাসের রেশন ও ৮০০০ টাকা ছাড়া কিছুই পায়নি। তাই তাদেরকে অন্যান্যদের ন্যায় সুবিদাধি প্রদান করা। ১১. বিরাজিত পরিস্থিতির কারণে স্থানান্তরিত ২টি বাজার, ৬টি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ১টি উচ্চ বিদ্যালয় পূর্বতন স্থানে স্থানান্তর করা ও শরণার্থীদের জায়গার উপর অবৈধভাবে স্থাপিত ৪টি বেসরকারী বাজার উচ্ছেদ করা। ১২. টাস্ক ফোর্স সভায় সিদ্ধান্ত মোতাবেক সরকার কর্তৃক প্রদত্ত রেশনের পরিবহন, ঘাটতি বিতরণ ও উঠানামার বকেয়া খরচের টাকা অবিলম্বে প্রদান করা। ১৩. জুম্ম শরণার্থীদের যথাযথ পুনর্বাসনের লক্ষ্যে টাস্ক ফোর্সের চেয়ারম্যান অবিলম্বে নিযুক্ত করে টাস্ক ফোর্সের কার্যক্রম শুরু করা। ১৪. চুক্তি মোতাবেক জুম্ম শরণার্থী বেকার যুবক/যুবতিদের এক ধাপ শিক্ষাগত যোগ্যতা ও বয়স ৪০ বছর পর্যন্ত শিথিল করে চাকুরীতে নিয়োগ দান ও আত্মকর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা। ১৫. যে সমস্ত পরিবার বসতভিটা ও জমি জমা ফেরত পায়নি তাদেরকে জমি জমা ফেরত প্রদান ও গৃহ নির্মাণের ১০,০০০ (দশ হাজার) টাকা ও কৃষি অনুদান বাবত ৫,০০০ (পাঁচ হাজার) টাকা প্রদান করা। ১৬. ভারত প্রত্যাগত জুম্ম শরণার্থীদের জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রতিটি থানায় উপজাতীয় কনস্টেবল ও সাব-ইন্সপেক্টর নিয়োগ করা। ১৭. পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন আইন ২০০১ সংশোধন করে ভূমি কমিশনের কার্যক্রম শুরু করা। ১৮. চুক্তি মোতাবেক সকল অস্থায়ী সেনা, আনসার, এপিবি ও ভিডিপি ক্যাম্প অবিলম্বে প্রত্যাহার করা। ১৯. জুম্ম শরণার্থীদের সুষ্ঠু পুনর্বসানের লক্ষ্যে আভ্যন্তরীণ জুম্ম উদ্বাস্তুদেরও পুনর্বাসন করা। ২০. পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি যথাযথ বাস্তবায়ন করা এবং স্থায়ী বাসিন্দাদের নিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের ভোটার তালিকা প্রণয়ন করা ও উক্ত ভোটার তালিকা দিয়ে সকল নির্বাচন অনুষ্ঠিত করা। ২১. পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান পদে খাগড়াছড়ি থেকে নির্বাচিত এমপি জনাব আব্দুল ভূঁইয়ার নিয়োগাদেশ বাতিল করা এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি মোতাবেক একজন উপজাতীয়কে উক্ত বোর্ডের চেয়ারম্যান হিসেবে নিয়োগদান করা। ২২. দেশে অন্যান্য জেলার মত জাতীয় সংসদে পার্বত্য অঞ্চলের তিন পার্বত্য জেলার জন্য প্রতিটি জেলায় একটি করে মোট তিনটি মহিলা আসন সংরক্ষণ করা। ❐

স্বাধিকারের পাঠক ও শুভাকাঙ্ক্ষীদের প্রতি বৈসাবি ও বাংলা নববর্ষের শুভেচ্ছা
- স্বাধিকার সম্পাদক মন্ডলী

এলাকা সংবাদ

সন্তু লারমার ব্ল্যাক ডগ বাহিনী কর্তৃক সাম্প্রতিক অপহরণ ও খুন

৩য় পাতার পর

পা কেটে দেয়।

তুধিল অপহরণ ও খুনের ঘটনার পর পুরো হরিনাথ পাড়া এলাকায় চরম আতংক বিরাজ করে। সন্ত্রাসীরা মামলা না করার জন্য তার পরিবারের সদস্যদের ওপর চাপ অব্যাহত রাখে। এমনকি তুধিল চাকমার স্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে বলে প্রচার করতে তার আত্মীয়দেরকে বাধ্য করে।

চট্টগ্রামের রাণীর হাট কলেজের ছাত্র তুধিল চাকমা বিগত সংসদ নির্বাচনে ইউপিডিএফ প্রার্থী প্রসিত খীসার পক্ষে প্রচারণায় অংশগ্রহণ করেছিল। সন্তু সন্ত্রাসীদের বাধাদান সত্বেও তিনি ভোট কেন্দ্রে গিয়ে নিজের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন। এজন্য সন্ত্রাসীরা তার বিরুদ্ধে ক্ষেপে গিয়েছিল। তাকে অপহরণ ও খুন করার কারণ এটাই বলে এলাকাবাসীর বদ্ধমূল ধারণা।

লংগদুতে ব্ল্যাক ডগ সন্ত্রাসী কর্তৃক ৪ ব্যক্তি খুন

স্বাধিকার রিপোর্ট॥ রাঙ্গামাটি জেলার লংগদুতে সন্তু লারমার লেলিয়ে দেয়া ব্ল্যাগ ডগ সন্ত্রাসীরা চার নিরীহ ব্যক্তিকে অপহরণের পর খুন করেছে। গত ১৯ তারিখ তারা বামে লংগদু গ্রামের বৈরাগী চাকমা (৩১) পিতা আদেধন চাকমাকে অপহরণ করে নিয়ে যায়। পরে তাকে মেরে ফেলা হয়েছে বলে জানা গেছে। এর পর সন্ত্রাসীরা ভাইবোন ছড়া গ্রামের ত্রিদিব চাকমা (৩৫) পিতা নোয়ারাম চাকমা ও দয়া রাম চাকমা (৩৯) পিতা বালুবেচ্যা চাকমা এবং রাঙাপানি ছড়া গ্রামের জুরানী সেন মেম্বার (৩৯) কে অপহরণ ও পরে খুন করে।

এদের মধ্যে ত্রিদিব চাকমা ও দয়ারাম চাকমাকে মাল্যা থেকে ফেরার পথে ব্ল্যাক ডগ সন্ত্রাসীরা আটকায়। তাদেরকে অমানুষিকভাবে মারধর করার পর মেরে ফেলা হয়। কারোর লাশ উদ্ধার করা যায়নি।

এলাকাবাসীরা জানান, জেএসএস-এর লংগদু শাখার সহসভাপতি ও লংগদুর প্রাক্তন ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান সুখময় চাকমা ও জেএসএস-এর লংগদু থানা শাখার সাধারণ সম্পাদক দয়াল চন্দ্র চাকমা এই ঘটনার জন্য দায়ি।

খাগড়াছড়ির গুলোকানা পাড়ায় সন্তু সন্ত্রাসীদের হামলা

স্বাধিকার রিপোর্ট॥ জনগণের প্রবল প্রতিরোধে দিশেহারা হয়ে সন্তু লারমা চক্র এখন পোড়া মাটির নীতি গ্রহণ করেছে। তারা এখন দখলদার সেনাবাহিনীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে।

গত ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০০২ সন্তু লারমার লেলিয়ে দেয়া সন্ত্রাসীরা খাগড়াছড়ির পেরাছড়া এলাকার ফাগুলক্যা পাড়া ও গুলকানা পাড়ায় হামলা চালায়। তারা বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর কায়দায় দুই গ্রামের ১৬ ব্যক্তিকে মারধর করে ও শশীকুমার চাকমার বাড়ি জ্বালিয়ে দেয়। ফলে নগদ ৪০ হাজার টাকা সহ আনুমানিক ৮০ হাজার টাকার সম্পত্তি আগুনে পুড়ে যায়। সন্ত্রাসীদের হাত থেকে ৫ বছরের শিশুও বাদ যায়নি।

যারা ঐদিন সন্তু সন্ত্রাসীদের প্রহারের শিকার হয়েছেন তারা হলেন, ফাওলক্যা পাড়ার শশীকুমার চাকমা (যার বাড়ি জ্বালিয়ে দেয়া হয়) ৩০ পিতা তালুক্যা চাকমা, কালী কুমার চাকমা ৩৫ পিতা দীন রাম চাকমা, বীর কুমার চাকমা ৪০ পিতা ননেয়া চাকমা, বসুলতা চাকমা ২৫ স্বামী কালী কুমার চাকমা, নতুন মায়া চাকমা ৩২ স্বামী শান্তি কুমার চাকমা, কালাবি চাকমা ৫৫ স্বামী রঞ্জন চাকমা, পূর্ণশোভা চাকমা ২৭ স্বামী শশী কুমার চাকমা, শান্তি কুমার চাকমা ৪০ পিতা রাজেন্দ্র চাকমা, নীল প্রদীপ চাকমা ৪৫ পিতা ইন্দ্রসেন চাকমা, প্রদীপ বিকাশ চাকমা ১৮ পিতা নীল প্রদীপ চাকমা, এলিনা চাকমা ৫ পিতা কালী কুমার চাকমা, মুকুল বিকাশ চাকমা ২৮ পিতা ললিত মোহন চাকমা। গুলকানা পাড়ায় যাদেরকে মারধর করা হয় তারা হলেন হেম রঞ্জন চাকমা ৬৫ পিতা মৃত গুলকানা চাকমা, রূপায়ন চাকমা ৩০ পিতা হেম রঞ্জন চাকমা, দেবরাজ চাকমা ৪৫ পিতা পূর্ণকান্ত চাকমা ও বেধক চান চাকমা ২৮ পিতা মদন মোহন চাকমা।

ঘাগড়া-কাউখালি এলাকায় সন্তু লারমার সন্ত্রাসীদের কান্ডকারখানা

স্বাধিকার প্রতিনিধি॥ সন্তু লারমার সন্ত্রাসী ব্ল্যাক ডগ বাহিনী রাঙ্গামাটির ঘাগড়া-কাউখালি এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন সন্ত্রাসী কার্যকলাপ চালিয়ে যাচ্ছে। তাদের উৎপাতে বর্তমানে সেখানে সাধারণ জনগণের জনজীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। সারাক্ষণ ভয়ে ভয়ে থাকতে হয় কখন ব্ল্যাক ডগ বাহিনীর সন্ত্রাসীরা গ্রামে হানা দেয়, কখন তাদের মুখে পড়তে হয়। সাধারণ জনগণের চোখে সেনাবাহিনী ও সন্তু লারমার ব্ল্যাক ডগ বাহিনীর মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। সেনাবাহিনী যেভাবে গ্রামে গ্রামে হানা দিয়ে লোকজনের ওপর অত্যাচার নির্যাতন চালাতো, বাড়িঘর পুড়িয়ে দিতো, লুটপাট চালাতো, বর্তমানে সন্তু লারমার ব্ল্যাক ডগ বাহিনীও তাই করছে। সেজন্য এই ব্ল্যাক ডগ বাহিনীর বিরুদ্ধে সাধারণ জনগণের ক্ষোভ এখন চরম মাত্রায় পৌঁছেছে। অনেক জায়গায় গ্রামের লোকজন নিজেরাই সংগঠিত হয়ে তাদের প্রতিরোধ করতে বাধ্য হচ্ছেন। নীচে ব্ল্যাক ডগ নামক সন্তু লারমার সন্ত্রাসী বাহিনীর গণবিরোধী কিছু কার্যকলাপ তুলে ধরা হল:

১. গত ২৪শে জুলাই ২০০১ আত্মসমর্পনকারী জেএসএস সদস্য বুজ্যা কমান্ডারের নেতৃত্বে ব্ল্যাক ডগ বাহিনীর ২০-২২ জনের একটি দঙ্গল ৩ নং ঘাগড়া ইউনিয়নের ইছামতি, পানছড়ি, উল্ল, ডেবাছড়ি, শুকনাছড়ি, ঘিলাছড়ি, কজইছড়ি, হারাঙ্গী, চেলাচড়া ইত্যাদি গ্রামে হানা দেয়।

সন্ত্রাসীরা পানছড়ি গ্রামের লালকৃষ্ণ চাকমার বাসায় থাকা গৃহ শিক্ষক শংকর চাকমাকে ধরে নিয়ে যায়। তাকে সাংঘাতিকভাবে মারধর করার পর ছেড়ে দেয়া হয়। মারাত্মকভাবে আঘাত পাওয়ার কারণে তাকে ঘাগড়ায় চিকিৎসাধীন থাকতে হয়।

উল্লপাড়ায় ব্ল্যাক ডগ সন্ত্রাসীরা নিরীহ গ্রামবাসীদের লক্ষ্য করে গুলি ছোঁড়ে। তবে এতে অক্ষত অবস্থায় সবাই পালাতে সক্ষম হয়।

এর কিছুক্ষণ পর সকাল আনুমানিক পৌনে ন'টায় এলোপাথারি ব্রাশ ফায়ার করতে করতে ঘিলাছড়ি গ্রামের বাবু শান্তি জীবন চাকমার (৪৫) বাড়ি ঘেরাও করে ও সেনাবাহিনীর কায়দায় তল্লাশী চালানোর নামে বাড়ির জিনিসপত্র তছনছ করে দেয়। সন্ত্রাসীরা তার গায়ে লাথি মারে ও তার যুবতি মেয়ে এসএসসি পরিক্ষার্থীনী মিস নমিতা চাকমাকে মারতে উদ্যত হয়। তারা অকথ্য ভাষায় গালি গালাজ ও অশালীন ব্যবহার করে। বাবু শান্তি জীবন চাকমার পরিবারের ওপর ব্ল্যাক ডগদের ক্ষিপ্ত হবার কারণ হলো সম্প্রতি ইউপিডিএফ-এর কেন্দ্রীয় নেতা সচিব চাকমার সাথে তার এক মেয়ের বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন। সন্তু চক্রের ব্ল্যাক ডগদের রাজনৈতিক প্রতিহিংসা যে কত গভীর ও তাদের ন্যুনতম মানবিক মূল্যবোধও যে লোপ পেয়েছে সেটা এই ঘটনা থেকে না বোঝার কোন উপায় নেই।

সাধারণ গ্রামবাসীদের কথা হলো, ইউপিডিএফ নেতার সাথে মেয়ে বিয়ে দেয়ার কারণে কাউকে মারধর করা চরম অন্যায় ও অমানবিক। এটা কোনভাবেই মেনে নেয়া যায় না।

২. আদিকান্ত চাকমা জারুল ছড়ি গ্রামের একজন অত্যন্ত নিরীহ খেটে খাওয়া লোক। অথচ সেও ব্ল্যাক ডগ সন্ত্রাসীদের হাত থেকে রেহায় পেল না। গত ১১ আগষ্ট সন্তু চক্রের ব্ল্যাক ডগরা তার কাছ থেকে ৬০ হাজার টাকা চাঁদা দাবি করে ও নগদ ৩০ হাজার টাকা ছিনিয়ে নেয়। একইদিন সন্ত্রাসীরা মিদিঙ্গ্যা ছড়ি গ্রামের অমলেন্দু চাকমার হালের বলদও জোর করে নিয়ে যায় ও চৌচালা বিলি গ্রামের স্বপ্না চাকমার কাছ থেকে ১০ হাজার টাকা চাঁদা দাবি করে। উল্লেখ্য, এর আগে সন্তু চক্রের সন্ত্রাসীরা তার বড় দুই ভাই রত্নসেন চাকমা ও বিনয় চাকমাকে গভীর জঙ্গলে অপহরণ করে নিয়ে গিয়ে পরে জবাই করে খুন করে। এছাড়া গুলি করে সন্ত্রাসীরা তার বাবা, মা ও নানীকেও আহত করে। তাদেরকে দীর্ঘদিন চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজে চিকিৎসা করাতে হয়। বর্তমানে তাঁরা পঙ্গু অবস্থায় আছেন। অপরদিকে তার বাবা লক্ষীকুমার চাকমা ব্ল্যাক ডগ সন্ত্রাসীদের ভয়ে ঘর ছাড়া হয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন। তার এই দুঃখের অবসান কবে হবে তিনি জানেন না।

৩. এর আগে এ বছর ২৮শে মার্চ ব্ল্যাক ডগ সন্ত্রাসীরা ঘাগড়া বাজার থেকে ইন্দ্রকেতু চাকমা (৬৫) ও মানেক্ক চাকমাকে (২৮) ধরে নিয়ে যায়। মানেক্ক চাকমা সন্ত্রাসীদের হাত থেকে কোনমতে পালিয়ে আসতে সক্ষম হয়। তবে বৃদ্ধ ইন্দ্রকেতু চাকমাকে তারা গভীর জঙ্গলে নিয়ে গিয়ে দীর্ঘদিন আটকিয়ে রাখে। তার ওপর অমানুষিক শারীরিক নির্যাতন চালানো হয়। সন্ত্রাসীরা মুক্তিপণ আদায়ে ব্যর্থ হলে পরে তাকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়।

এই ঘটনার একদিন পর অর্থাৎ ২৯শে মার্চ কাউখালি বাজার থেকে ব্ল্যাক ডগরা পানছড়ি গ্রামের লালকৃষ্ণ চাকমাকে জোরপূর্বক টেম্পিতে উঠিয়ে অপহরণ করে নিয়ে যায়। তাকে তারা বেদম মারধর করে ও কুকুরের মতো তার শরীরের বিভিন্ন জায়গায় কামড় দেয়। পরে তাকে ছেড়ে দেয়া হয়।

৪. গত ২৬শে আগষ্ট ব্ল্যাক ডগ সন্ত্রাসীরা ঘিলাছড়ি ও উল্টাপাড়ায় ৪ জনকে মারধর করে। ঘিলাছড়ি গ্রামের ভূবন বিকাশ চাকমা পিতা বৃষ কুমার চাকমা ঐদিন তার মাসি বাড়ি থেকে বাড়ি ফিরছিলেন। পথে তিনি তথাকথিত ব্ল্যাক ডগ নামক সন্ত্রাসীদের মুখে পড়েন। সন্ত্রাসীরা প্রথমে তার কাছ থেকে জানতে চায়, ইউপিডিএফ -এর স্থানীয় নেতা কর্মিদের তিনি চেনেন কিনা ও তারা কোথায় থাকেন সে ব্যাপারে জানেন কিনা। তিনি চেনেন না বললে ব্ল্যাক ডগরা সঙ্গে সঙ্গে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। তারা শক্ত বাঁশের লাঠি দিয়ে তাকে মারধর করে।

উল্টাছড়ি গ্রামের ভগ চাকমা (শান্তি) পিতা মৃত দুর্গা চরণ চাকমার কপালেও একই দশা ঘটে। তিনি সেদিন খালে বাঁশ নামানোর পর বাড়ি ফিরছিলেন। পথে ব্ল্যাক ডগ সন্ত্রাসীরা তাকে আটকায় ও অহেতুক হয়রানি করে। ব্ল্যাক ডগদের অন্যতম হোতা চেরাগালি তাকে প্রশ্ন করে, "তোমরা কাকে ভালবাস - এক নম্বর নাকি দুই নম্বর? এই প্রশ্ন শুনে ভগ চাকমা সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিয়ে বলেন, "আমরা দুই নাম্বারীদের ভালবাসি না"। শুনে ক্ষিপ্ত হয়ে যায় ব্ল্যাক ডগরা। শুরু হয় বেত্রাঘাত।

এর পর কিষ্ট লাল চাকমার পালা। তার পিতার নাম হলো সুখ কমল চাকমা। তিনিও উল্টাছড়ি গ্রামের বাসিন্দা। ঐদিন তিনি গোসল ছেড়ে বাড়িতে আসার পথে ব্ল্যাক ডগদের কবলে পড়েন। তাকেও একই কায়দায় আবোল তাবোল জিজ্ঞেস করার পর মারধর করা হয়। সন্ত্রাসীরা তাকে আধমরা অবস্থায় রেখে ফেলে চলে যায়।

উল্টা রাঙ্গী পাড়া গ্রামের পুলিন বিকাশ চাকমা পিতা পিয়ারী মোহন চাকমা গ্রামের সামাজিক শৃঙ্খলা বিষয়ে মুরুব্বীদের নিয়ে তুষার কান্তি চাকমার বাড়িতে আলোচনা করছিলেন। সে সময় সন্তু চক্রের লেলিয়ে দেয়া ব্ল্যাক ডগরা সেখানে উপস্থিত হয়। ব্ল্যাক ডগদের সর্দার চেরাগালি পুলিন বিকাশ চাকমাকে জিজ্ঞেস করে নির্বাচনে তিনি ভোট দেবেন কিনা এবং কাকে ভোট দেবেন। তিনি ভোট দেবেন বললে সঙ্গে সঙ্গে চেরাগালি তেলে বেগুনে জ্বলে উঠে। সে সবাইকে লাঠি উঁচিয়ে হুমকি দিয়ে বলে, যে ভোট দেবে তার আঙ্গুল কেটে দেয়া হবে, পা ভেঙ্গে দেয়া হবে।

৫. গত ১লা সেপ্টেম্বর সন্তু লারমার লেলিয়ে দেয়া ব্ল্যাক ডগ সন্ত্রাসীরা চেলা গ্রামে হানা দেয়। তখন বিকেল আনুমানিক ৫টা। সন্ত্রাসীরা সেখান থেকে পরিমল চাকমা পিতা দয়াল ধন চাকমাকে নিজ বাড়ি থেকে অপহরণ করে নিয়ে যায়। ব্ল্যাক ডগরা তার ওপর অমানুষিক শারীরিক নির্যাতন চালায়। তবে তারপর দিন অর্থাৎ ২রা সেপ্টেম্বর তিনি সন্ত্রাসীদের মিদিঙ্গ্যাছড়ি আস্তানা থেকে পালিয়ে আসতে সক্ষম হন। একই দিন বাদলছড়ি গ্রামের ধন চাকমাকেও ব্ল্যাক ডগ সন্ত্রাসীরা মারধর করে।

সর্বশেষ খবরে জানা গেছে, গত ১২ মার্চ জনৈক আত্মসমর্পনকারী জেএসএস সদস্য ইন্দু চাকমা ওরফে বিজিমুয়া ও তার সন্ত্রাসী বাহিনী গুলকানা পাড়া ও ফাগুলুক্যা পাড়ার কার্বারীদেরকে গাছবান নামক স্থানে ডেকে তাদের কাছ থেকে দুই লাখ টাকা চাঁদা দাবি করে। এই দুই পাড়ার লোকজন এখন সন্ত্রাসীদের ভয়ে গ্রাম ছাড়তে বাধ্য হয়েছেন।

বরকল-সুবলং

২৭শে জুলাই ২০০১

সন্তু লারমার লেলিয়ে দেয়া ব্ল্যাক ডগ সন্ত্রাসীরা মরংছড়ি মোনপাড়া গ্রামে শান্তি কুমার চাকমা (ওরফে মিস্টার মিঞা) বয়স ৩৮ পিতা প্রফুল্ল কুমার চাকমার বাড়িতে লুটপাট চালানোর পর তাতে আগুন ধরিয়ে দেয়।

১২ আগষ্ট ২০০১

সকাল ৭টার দিকে ব্ল্যাক ডগরা হাজাছড়া গ্রামে হানা দেয়। তারা পিটিয়ে ২ ব্যক্তিকে জখম করে। এরা হলেন ফুলরাজ চাকমা (৩৫) পিতা ধনঞ্জয় চাকমা ও শান্তি শংকর চাকমা (৩০) পিতা ধুলকুল্যা চাকমা। শেষোক্ত ব্যক্তি হলেন অধুনালুপ্ত শান্তিবাহিনীর সদস্য। সন্ত্রাসীরা অপর ৬ জনকে অপহরণের চেষ্টা চালায়। এরা হলেন, কালাতুম চাকমা (৪০) পিতা হরান্যা চাকমা, বিনয় প্রিয় চাকমা (২০) পিতা সুরজয় চাকমা, লক্ষীরাজ চাকমা (২৫) পিতা ধনঞ্জয় চাকমা, রিপন চাকমা (১৬) পিতা কালাতুম চাকমা, মরত্তো চাকমা (১২) পিতা মৃত মহেন্দ্র চাকমা ও কেগেরা চাকমা (১৬) পিতা শান্তি লাল চাকমা।

ব্ল্যাক ডগ সন্ত্রাসীরা তাদেরকে বেঁধে গভীর জঙ্গলে নিয়ে যায়। পরে হাজা ছড়া ও ইন্দ্রমা ছড়া গ্রামের আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা সবাই এক হয়ে তেড়ে আসলে সন্ত্রাসীরা উপরোক্ত ব্যক্তিদেরকে ফেলে পালিয়ে যায়। ক্ষুদ্ধ জনতা বসন্ত মোন পর্যন্ত সন্ত্রাসীদেরকে তন্ন তন্ন করে খোঁজ করে। পরে তারা সুবলং বাজারে এসে সেখানেও "দুই নাম্বারী" ও "আদম বেপারী" অর্থাৎ জেএসএস সদস্যদের খুঁজতে থাকেন। জনতার এই রুদ্র রোষ দেখে সেদিন ব্ল্যাক ডগ সন্ত্রাসী ও জেএসএস সদস্যরা ভীরুর মতো এলাকা ছেড়ে পালিয়ে যায়। আসলে সন্তু লারমার সন্ত্রাসীরা যতই হম্বি তম্বি করুক, যতই নৃশংস হয়ে জনগণের ওপর অত্যাচার চালাক, তারা ভিতরে অত্যন্ত দুর্বল। তাদের সশস্ত্র সন্ত্রাস শক্তির পরিচয় নয়, তা তাদের দুর্বলতারই বহিঃপ্রকাশ। সাধারণ জনগণ সংঘবদ্ধ হয়ে প্রতিরোধ করলেই তারা পালিয়ে যায়। ইতিহাসে দেখা যায়, নিরস্ত্র জীর্ণশীর্ণ অভুক্ত জনগণ যখনই জেগে ওঠে ঐক্যবদ্ধ হয়েছেন, তখন তাদের অত্যাচারী বর্বর শাসকদের পতন হয়েছে। জনগণকে নিজেদেরকেই সংগঠিত হয়ে নিজেদের শত্রুদের মোকাবিলা করতে হয়, অধিকার ছিনিয়ে আনতে হয়। সংগঠিত জনতার কাছে সকল অপশক্তি পরাজিত হতে বাধ্য।

এছাড়া ঐদিন ব্ল্যাক ডগরা ইন্দ্রমা ছড়া গ্রামের ৩ জনকে পিটিয়ে জখম করে। এরা হলেন, আলোময় চাকমা (১৭) পিতা পূর্ণ কুমার চাকমা, সুখময় চাকমা (২২) পিতা অশোক কুমার চাকমা ও হিতেন চাকমা (১২) পিতা জগদীশ হেডম্যান। সন্ত্রাসীরা বিনিময় চাকমা (৩০) পূর্ণ কুমার চাকমা ও অশোক কুমার চাকমা (৪৫) পিতা বন মোহন চাকমাকে অপহরণের চেষ্টা চালায়। কিন্তু গ্রামবাসীদের প্রবল প্রতিরোধের মুখে তাদেরকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়।

ব্ল্যাক ডগ সন্ত্রাসীরা পিসিপি'র কেন্দ্রীয় সদস্য শান্তিপ্রিয় চাকমার কাছ থেকে নগদ ৫০৩০ টাকা ও নীল ময় চাকমার কাছে থেকে টর্চ পেন্ট শার্ট ইত্যাদি লুট করে নিয়ে যায়। তারা কালাতুম চাকমা (৪০) পিতা রনজন্যা চাকমা ও ইলিনা চাকমা (৮) পিতা নীলময় চাকমাকে হুমকি দেয়। পালিয়ে যাওয়ার সময় সন্ত্রাসীরা শান্তিপ্রিয় চাকমার জুমক্ষেত নষ্ট করে চলে যায়।

২৪শে আগষ্ট

সন্তু লারমার লেলিয়ে দেয়া ব্ল্যাক ডগরা মরংছড়ি মোন পাড়ায় হানা দেয়। তারা শান্তিপ্রিয় চাকমা পিতা প্রফুল্ল কুমার চাকমা ও বিনোদ বিহারী চাকমা (১৮) পিতা সুভাষ চন্দ্র চাকমা নামে দুই ব্যক্তিকে পিটিয়ে জখম করে ও পাঁচটি বাড়িতে লুটপাট চালায়। যাদের বাড়িতে সন্ত্রাসীরা লুটতরাজ চালায় তারা হলেন ও প্রফুল্ল কুমার চাকমা (৬৬) পিতা সূর্যমোহন চাকমা, ত্রিদিব চাকমা (২৮) পিতা প্রফুল্ল কুমার চাকমা, জয়ন্ত কুমার চাকমা (৩৫) পিতা রজনী কুমার চাকমা, আনন্দ চাকমা ওরফে হেয়ত্যা (২৫) পিতা রজনী চাকমা ও কুমপেদা চাকমা পিতা রজনী কুমার চাকমা।

জেএসএস সন্ত্রাসী কর্তৃক কলি খীসা অপহৃত, একদিন পর মুক্তি

স্বাধিকার রিপোর্ট॥ ৩১ অক্টোবর আত্মসমর্পনকারী প্রাক্তন শান্তিবাহিনীর সদস্য বিনয়কৃষ্ণ খীসার নেতৃত্বে সন্তু লারমার লেলিয়ে দেয়া সন্ত্রাসীরা মহালছড়ি থেকে কলি খীসাকে অপহরণ করে। অবশ্য এলাকাবাসীদের প্রবল প্রতিবাদের মুখে একদিন পর অপহরণকারীরা তাকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। অপহরণের কারণ জানা যায়নি, তবে স্থানীয় এলাকাবাসীদের ধারণা গত সংসদ নির্বাচনে ইউপিডিএফ-এর মনোনীত প্রার্থী প্রসিত খীসার পক্ষে প্রচারণা চালানোর জন্য সন্ত্রাসীরা তাকে অপহরণ করে থাকতে পারে।

এলাকা সংবাদ

সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে খাগড়াছড়িতে সর্বস্তরের নারীদের প্রতিবাদ মিছিল ও স্মারকলিপি পেশ

স্বাধিকার রিপোর্ট॥ খাগড়াছড়িতে সন্ত্রাস ও অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে নারী সমাজের ঐতিহ্য দীর্ঘ দিনের। লোগাং লং মার্চ থেকে শুরু করে, পুলিশী বর্বরতা, মুখোশ বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ও হরেন্দ্র-হুরুক্যার খুনীদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে নারী সমাজের ছিল বলিষ্ঠ ও দুঃসাহসিক ভূমিকা। এবারেও ইউপিডিএফ-এর একনিষ্ঠ কর্মি ও পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের প্রাক্তন সভাপতি রূপক চাকমা হত্যার পর খাগড়াছড়ির সচেতন প্রতিবাদী নারী সমাজ চুপ করে বসে থাকতে পারলেন না। সন্তু লারমার লেলিয়ে দেয়া সন্ত্রাসীদের অব্যাহত হামলা, খুন ও অপহরণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে ঘরকন্নার কাজ ফেলে তারা রাজপথে বেরিয়ে আসতে বাধ্য হলেন।

"খাগড়াছড়ির সর্বস্তরের মা বোনেরা" এই ব্যানারে ২৬ সেপ্টেম্বর আয়োজন করা হয় মিছিলটি। এটি ছিল একটি মৌন মিছিল। সব বয়সের শত শত নারী খাগড়াছড়ির রাজপথে এসে সামিল হন। "আর কোন মায়ের কোল খালি হতে দেব না" এই ছিল মিছিলের নেপথ্য শ্লোগান। মিছিলটি রেড স্কোয়ার থেকে শুরু হয়ে ডিসি অফিস পর্যন্ত যায় এবং শহীদ রূপক চাকমার মা জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে প্রধান উপদেষ্টার বরাবরে একটি স্মারকলিপি পেশ করেন। এতে তিনটি দাবি জানানো হয় যেমন, ১. চিহ্নিত সন্ত্রাসীদেরকে অবিলম্বে গ্রেফতার করা, ২. অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে ও ৩. নির্বাচন প্রতিহতের নামে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীদের বিরুদ্ধে দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

এরপর ডিসি অফিসের সামনে এক প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এতে বোনদের পক্ষে বক্তব্য রাখেন প্রমিকা চাকমা, জেসমিন চাকমা, অন্তরিকা চাকমা এবং মা'দের পক্ষে বক্তব্য রাখেন কল্যাণী চাকমা ও ব্রজবালা চাকমা।

জেলা প্রশাসক প্রদত্ত স্মারকলিপির জবাবে সমাবেশে অংশগ্রহণকারী নারী সমাজের উদ্দেশ্যে বলেন, "আমি আপনাদের ঐক্য দেখে অনুপ্রাণিত হয়েছি"। তিনি স্মারকলিপিতে উল্লেখিত মা বোনদের দাবি পূরণ করা হবে বলে আশ্বাস প্রদান করেন।

সন্তু চক্রের সন্ত্রাসীদের হাতে একব্যক্তি অপহৃত

স্বাধিকার রিপোর্ট ॥ ১১ জুন ২০০১ সোমবার বিকেল চারটার সময় সন্তু লারমার লেলিয়ে দেয়া সন্ত্রাসীরা রাঙ্গামাটি জেলার ঘিলাছড়ি ইউনিয়নের কুকুরমারা নামক স্থান থেকে শ্যামল চাকমা নামে এক ব্যক্তিকে অপহরণ করে নিয়ে যায়। তিনি নান্যাচর থানা সদরে কৃষি ব্যাংক থেকে কৃষি ঋণ নিয়ে গাড়ি না পেয়ে পায়ে হেঁটে বাড়ি ফিরছিলেন।

সন্ত্রাসীরা প্রথমে তাকে গুল্যাছড়ি নিয়ে যায়। সেখানে তাকে গ্রামবাসীদের সামনে উলঙ্গ অবস্থায় নাচতে ও গান গাইতে বাধ্য করে। এরপর সন্ত্রাসীরা তাকে হাতিমারা থুম নামক স্থানে নিয়ে গিয়ে মধ্যযুগীয় কায়দায় নির্যাতন চালায়। রাতে তাকে বেঁধে রাখা হয় এবং কণিকা রঞ্জন চাকমা (হাজাছড়ি পশ্চিম পাড়া) ও গগণ্য চাকমা (কৃষ্ণমাছড়া) তাকে পাহারা দেয়। তারা তখন মদের নেশায় মাতাল। সন্ত্রাসীরা মাতাল অবস্থায় একসময় ঘুমিয়ে পড়লে শ্যামল চাকমা পালিয়ে গিয়ে বুড়িঘাট আর্মি ক্যাম্পে আশ্রয় নেয়। সেনারা তাকে নিরাপদে বাড়ি পৌঁছে দেয়।

বর্তমানে ঘিলাছড়ির "সমাজ কল্যাণ" থেকে নান্যাচর রাস্তা মাথা পর্যন্ত এলাকা সন্তু লারমার সন্ত্রাসীদের স্বর্গরাজ্য। একজন প্রাক্তন শান্তিবাহিনী সদস্যের (বর্তমানে নিষ্ক্রিয়) নেতৃত্বে সন্ত্রাসীরা এই এলাকায় প্রতিদিন চাঁদাবাজি, অপহরণ, ডাকাতি ও খুন করে থাকে। একবার উত্তম চাকমা (রামহরি পাড়া), কণিকা চাকমা (পশ্চিম হাজাছড়ি পাড়া), গগণ্যা চাকমা (কৃষ্ণমাছড়া), হেগেরা চাকমা (রামহরি পাড়া) ও বিদ্যাপূর্ণ চাকমা শিকল পাড়া এলাকায় চাঁদাবাজি করার সময় নান্যাচর থানার একটি পুলিশ পিকআপ সেখানে পৌঁছে। সন্ত্রাসীরা পুলিশ সদস্যদের লক্ষ্য করে গুলি চালায়। এর আগেও বহুবার সন্ত্রাসীরা পুলিশের লক্ষ্য করে গুলি চালিয়েছিল। তারা সমাজ কল্যাণ নামক স্থান থেকে দিঘীনালার বাসিন্দা মাইক্রো ড্রাইভার পরাণ্যা চাকমাকে অপহরণ ও খুন করে।

প্রাক নির্বাচনী সহিংসতা

সন্তু সন্ত্রাসীদের হাতে ৫ জন ইউপিডিএফ কর্মি নিহত

স্বাধিকার রিপোর্ট॥ সন্তু লারমার লেলিয়ে দেয়া সন্ত্রাসীদের হামলায় নির্বাচনের প্রাক্কালে ইউপিডিএফ-এর ৫ জন কর্মি ও সমর্থক প্রাণ হারিয়েছেন ও আরো ১৩ জন অপহৃত হয়েছেন। এদের মধ্যে ১১ জনকে ছেড়ে দিলেও বাকী দুই জনের অবস্থা এখনো জানা যায়নি।

তাদের ভাষায় নির্বাচন প্রতিহত করার জন্য ইউপিডিএফ -এর ওপর এ ধরনের সন্ত্রাসী হামলা চালানো হলেও রহস্যজনক কারণে সন্তু লারমা ও তার সন্ত্রাসী বাহিনী নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী অন্য কোন পার্টি বা প্রার্থীকে নির্বাচনী প্রচারণায় কোনরূপ বাধা প্রদান করেনি। তথ্যাভিজ্ঞ মহলের ধারণা, বিএনপি প্রার্থীদেরকে জিতিয়ে দেয়ার জন্যই সন্তু লারমা চক্র নির্বাচন প্রতিহত করার নাম করে ইউপিডিএফ-এর ওপর হামলা চালিয়েছে ও তাদের সমর্থকদেরকে ভোটদানে বাধা প্রদান করেছে। তাদের দৃঢ় অভিমত, নির্বাচনী তফসিল ঘোষণার আগে ঢাকায় সন্তু লারমা ও বিএনপি সেক্রেটারি জেনারেল মান্নান ভূঁইয়ার মধ্যে যে একান্ত বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় সেখানেই তাদের মধ্যে গোপন নির্বাচনী সমঝোতা হয় এবং সন্তু লারমা সেই ব্লুপ্রিন্ট মোতাবেক নির্বাচন প্রতিহত করার নাম করে ইউপিডিএফ-কে ঠেকানোর কৌশল অবলম্বন করেন, যাতে করে বিএনপি প্রার্থীদের জিতিয়ে দিতে সুবিধে হয়। সেজন্য দেখা যায়, সন্তু চক্র তার আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু কেবল ইউপিডিএফ-এর ওপরই সীমাবদ্ধ রাখেন। অন্য কোন পার্টি বা প্রার্থীর প্রচারণায় তারা বাধা দেয়নি। এমনকি নির্বাচন যারা আয়োজন করে থাকেন সেই রিটার্নিং অফিসার বা জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা তাদের কারোর ওপর তারা আঘাত করেনি।

সন্তু লারমার তথাকথিত নির্বাচন প্রতিহত করার কৌশলের প্রথম বলি হন বিপিন বিহারী কার্বারী (৬০)। তাকে সন্তু লারমার ব্ল্যাক ডগ সন্ত্রাসীরা গত ১৪ সেপ্টেম্বর ভোর রাতে দীঘিনালা উপজেলার নারেছড়ি এলাকায় ডুলুছড়ি গ্রামের নিজ বাড়িতে গুলি করে হত্যা করে। তিনি এলাকায় ইউপিডিএফ-এর মনোনীত প্রার্থী প্রসিত বিকাশ খীসার পক্ষে প্রচারণা চালাচ্ছিলেন।

এলাকার জনগণ জানান, ১৯৮৯ সালে শান্তিবাহিনীর সদস্যরা তার বিরুদ্ধে 'গ্রেফতারী পরোয়ানা' জারি করে। সে সময় তাকে দীঘিনালা সদরে তৎকালীন জেলা পরিষদ সদস্য চিরজ্যোতি চাকমার বাড়িতে লুকিয়ে থাকতে হয়েছিল।

১৫ সেপ্টেম্বর সন্তু লারমার সন্ত্রাসীরা খাগড়াছড়ির শিবমন্দির এলাকায় দুটি গ্রাম সাজেক পাড়া ও ৫নং যৌথ খামারে হামলা চালায়। এ সময় গ্রামবাসীরা খাগড়াছড়ি সদরে স্বনির্ভর বাজারে তীর ধনুকের (ইউপিডিএফ মনোনীত প্রার্থীর নির্বাচনী প্রতীক) নির্বাচনী সমাবেশে যোগ দেয়ার উদ্দেশ্যে জড়ো হচ্ছিলেন। সন্ত্রাসীরা ভোট না দেয়ার জন্য লোকজনকে ভয়ভীতি প্রদর্শন করে। কিন্তু গ্রামবাসীরা এর প্রতিবাদ জানায়। সন্ত্রাসীরা গ্রামবাসীদের সাথে যুক্তিকে পেরে না উঠলে এক পর্যায়ে এলোপাথারি ব্রাশ ফায়ার করে ও দু'টি বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেয়। পরে পুরো গ্রামের লোকজন তাদেরকে প্রতিরোধ করলে সন্ত্রাসীরা পালিয়ে যায়। যাবার পথে সন্ত্রাসীরা ৪ জনকে মারধর করে। এরা হলেন, নির্মল কান্তি চাকমা (৬০) পিতা বীরেন্দ্র চাকমা, পরিমল চাকমা ওরফে বলিচেলা (৪৫) পিতা বীরেন্দ্র চাকমা, জনতা দেবী চাকমা (৬০) স্বামী নির্মল চাকমা ও বাবলু চাকমা (২৫) পিতা সারদা চাকমা। এরা সবাই ৫নং প্রকল্প গ্রামের বাসিন্দা। গ্রামবাসীদের সংগঠিত প্রতিরোধের সময় সন্ত্রাসীদের এক জন মারাত্মকভাবে আহত ও পরে মারা যায় বলে জানা গেছে। তবে সন্ত্রাসীরা এ খবর গোপন রেখেছে।

এ সন্ত্রাসী হামলায় নেতৃত্ব দেয় সিন্ধু কুমার চাকমা, উষাকান্তি চাকমা ও কিরণ উদয় চাকমার নেতৃত্বে ১০/১২ জনের একটি সন্ত্রাসী দল। হামলার সময় তারা সবুজ রঙের পোশাক পরা ছিল। উল্লেখ্য, এর আগেও সন্ত্রাসীরা বেশ কয়েকবার শিবমন্দির এলাকায় হামলা চালিয়েছিল। কিন্তু প্রত্যেক বারই শিবমন্দিরের প্রতিবাদী জনতা তাদেরকে সাহসিকতার সাথে প্রতিরোধ করেন।

১৬ সেপ্টেম্বর সন্তু লারমার সন্ত্রাসীরা খাগড়াছড়ি পানছড়ি সড়কে বড়ইতলী নামক স্থানে ইউপিডিএফ-এর গাড়ির বহরে লক্ষ্য করে গুলি চালালে এতে ইউপিডিএফ কর্মি বিসুক্যা চাকমা (২৩) পিতা কিষ্ট লাল চাকমা ঘটনাস্থলে মারা যায় ও অপর তিন জন গুরুতর আহত হয়। বিসুক্যা চাকমার বাড়ি শিবমন্দির এলাকায় ৫নং যৌথ খামার গ্রামে।

ঘটনাটি ঘটে সাড়ে চারটার দিকে। ইউপিডিএফ-এর লোকজন চারটি জিপ যোগে পানছড়ি থেকে ফিরছিলেন। সেখানে ইউপিডিএফ-এর একটি নির্বাচনী সমাবেশ হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু ঐ সমাবেশের প্রস্তুতি চলাকালে সন্তু লারমার সন্ত্রাসীরা হামলা চালালে নির্বাচনী সমাবেশ প্রতিবাদ সমাবেশের রূপ নেয়। প্রায় ১২ জন ইউপিডিএফ-এর কর্মি ও সমর্থক পানছড়ির এ হামলায় আহত হন।

অপরদিকে বড়ইতলীর সশস্ত্র হামলায় যারা আহত হয়েছিলেন তারা হলেন, জ্যোতিময় চাকমা, সুনীল ত্রিপুরা, সোনা চাকমা ও রিপন চাকমা।

২১শে সেপ্টেম্বর সন্তু গ্রুপের সশস্ত্র সন্ত্রাসীরা খাগড়াছড়ি শহরের অনতিদূরে কৃষি গবেষণা এলাকার প্রতাপ চন্দ্র কার্বারী পাড়া থেকে সুকুমার দেওয়ানকে অপহরণ করে নিয়ে যায়। সেই পর থেকে তার কোন খোঁজ মেলেনি।

সুকুমার দেওয়ান (৪০) পিতা প্রতাপ চন্দ্র দেওয়ান ইউপিডিএফ-এর মনোনীত প্রার্থী প্রসিত খীসার পক্ষে এলাকায় প্রচারণার দায়িত্বে ছিলেন। তিনি পেরাছড়া ইউনিয়ন পরিষদের প্রাক্তন মেম্বার ও খাগড়াছড়ি উপজাতীয় ঠিকাদার সমিতির সাংগঠনিক সম্পাদক।

২১ সেপ্টেম্বর দুপুর একটার দিকে পুজগাঙের মধুমঙ্গল পাড়ায় সন্তু লারমার সন্ত্রাসীরা হামলা চালালে ইউপিডিএফ-এর একনিষ্ঠ কর্মি ও পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের প্রাক্তন সভাপতি রূপক চাকমা ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারান। ঐ সময় রূপক চাকমা ও ইউপিডিএফ-এর কর্মি সমর্থকরা নির্বাচনী সভা শেষে নতুন ধন চাকমার বাড়িতে দুপুরের খাবার খাচ্ছিলেন। সন্ত্রাসীরা তাদের স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র থেকে বেপরোয়া গুলি বর্ষণ করে। এ ঘটনায় আরো তিন জন গুরুতর আহত হন। তাদের একজন সুজিত চাকমাকে পরে চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি করা হয়। আহত বাকী দুই জন হলেন রাজেন্দ্রে মাস্টার পাড়ার মোহন চাকমা (২২) পিতা জ্ঞানেন্দ্র চাকমা ও সমাজ প্রিয় চাকমা (২৪)।

গ্রামবাসীরা হামলাকারীদের কয়েকজনকে চিনতে পেরেছেন। এরা হলো জঙ্গী চাকমা (৩৫) গ্রাম যুগলাক্ষ পাড়া, বাবুনীয়া চাকমা ওরফে উদয় পিতা আজুলুঙ্যা চাকমা গ্রাম নীলমনি হেডম্যান পাড়া ও ভুলচোগা চাকমা ওরফে চিরিঙ্গ্যা (পার্টি নাম এ্যালেন) পিতা পরাণ ধন চাকমা গ্রাম শণখোলা পাড়া। এদের মধ্যে জঙ্গী ও ভুলচোগা প্রাক্তন শান্তিবাহিনীর সদস্য। ১৯৯৭ সালের ২ ডিসেম্বর চুক্তির পর তারা সরকারের কাছে আত্মসমর্পন করে।

২৫শে সেপ্টেম্বর সন্তু লারমার সন্ত্রাসীরা ১১ জন ইউপিডিএফ কর্মি ও সমর্থককে অপহরণ করে। তারা ইউপিডিএফ-এর মহাসমাবেশে যোগদানের জন্য খাগড়াছড়ি যাচ্ছিলেন। এদের মধ্যে ১০ জনকে অপহরণ করা হয় রামগড় থেকে এবং অপর একজনকে দীঘিনালা থেকে। পরে স্থানীয় জনগণের ব্যাপক প্রতিবাদের মুখে সন্ত্রাসীরা তাদেরকে সেদিন রাতে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়।

২৭শে সেপ্টেম্বর সন্ত্রাসীরা আবার ইউপিডিএফ-এর দুই কর্মিকে খুন করে। ঘটনাটি ঘটে দীঘিনালায় বড়াদাম পুকুর পাড় নামক স্থানে। ঐদিন ইউপিডিএফ-এর কর্মি ও সমর্থকরা মেরুং-এ নির্বাচনী প্রচারণা শেষে দু'টি গাড়ি যোগে বাবুছড়া ফিরছিলেন। পথে বড়াদামের পুকুর পাড়ে ওঁৎপেতে থাকা সন্তু লারমার সন্ত্রাসীরা গাড়ি দুটি লক্ষ্য করে নির্বিচারে গুলি চালায়। এতে ঘটনাস্থলে উদ্দীপন চাকমা নামে ইউপিডিএফ-এর একজন কর্মি মারা যায় এবং পরে অপর একজন চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে মারা যায়। তার নাম কালো বিকাশ চাকমা পিতা রবি রঞ্জন চাকমা গ্রাম নুনছড়ি দীঘিনালা। উদ্দীপন চাকমার (২৩) বাড়ি হচ্ছে দীঘিনালার বাবুছড়ায়।

এছাড়া আহত ইউপিডিএফ সমর্থকরা হলেন রিকেন চাকমা (১৮) পিতা ধনচন্দ্র চাকমা গ্রাম বাবুছড়া, গাড়ির চালক উত্তম ত্রিপুরা পিতা সুরেশ ত্রিপুরা টিএন্ডটি, খাগড়াছড়ি এবং নিরন চাকমা গ্রাম পানছড়ি। তাদের সকলকে খাগড়াছড়ি সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

জেএসএস-এর যেসব সদস্য এ ঘটনার জন্য দায়ি তারা হলো ভারতেশ্বর চাকমা, জনপ্রিয় চাকমা, ধর্মবীর চাকমা, প্রাঞ্জল চাকমা, নরেশ চাকমা, জয়ন্ত চাকমা ও জগজ্যোতি চাকমা। তাদের সকলের বিরুদ্ধে দীঘিনালা থানায় মামলা দায়ের করা হয়েছে।

২৯ সেপ্টেম্বর সন্তু গ্রুপের সশস্ত্র সদস্যরা পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের মহালছড়ি থানা শাখার সভাপতি কিশলয় চাকমাকে লেমুছড়ি গ্রামের তার নিজ বাড়ি থেকে অপহরণ করে। সকাল ৬টার দিকে এ ঘটনা ঘটে।

বাড়ির লোকজন অপহরণকারীদের কয়েকজনকে সনাক্ত করতে পেরেছেন। এরা হলো বিনয় কৃষ্ণ খীসা ওরফে কণক, রিনিউ চাকমা, আইনষ্টাইন চাকমা ও পূর্ণাঙ্গ বরণ চাকমা। এদের মধ্যে প্রথম দুই জন আত্মসমর্পণকারী শান্তিবাহিনীর সদস্য। তাদের সকলের বিরুদ্ধে জিডি করা হয়েছে। অপহৃত কিশলয় চাকমার কি ঘটেছে তা এখনো জানা যায়নি।

সন্তু লারমার ব্ল্যাক ডগ বাহিনী কতৃক সাম্প্রতিক অপহরণ ও খুন

জেএসএস-এর সন্তু লারমা মদদপুষ্ট সন্ত্রাসীদের খুন ও অপহরণ অব্যাহত রয়েছে। নিম্নে কয়েকটি সাম্প্রতিক অপহরণ ও খুনের ঘটনা উল্লেখ করা হল:

বাবুল মারমা

গত ২৮ ডিসেম্বর ২০০১ রাত সাড়ে আটটার দিকে অজ্ঞাতনামা সন্ত্রাসীরা বাবুল মারমা (৩৮) নামে এক ব্যক্তিকে রাঙ্গামাটির চক্র পাড়া থেকে ধরে নিয়ে যায় বলে অভিযোগ রয়েছে। বিভিন্ন জায়গায় খোঁজ করেও তার কোন হদিস মেলেনি। চক্রপাড়াবাসীর ধারণা, জেএসএস-এর মদদপুষ্ট সন্ত্রাসীরা এ ঘটনার সাথে জড়িত থাকতে পারে। তবে জেএসএস-এর সাথে এ ব্যাপারে যোগাযোগ করা হলে তারা বরাবরের মতো কিছুই জানে না বলে জানিয়ে দেয়। কি কারণে তাকে অপহরণ করা হয় তা জানা যায়নি।

কমল কিষ্ঠ মেম্বার

সন্তু লারমার ব্ল্যাক ডগ সন্ত্রাসীরা গত ৮ জানুয়ারি ২০০২ রাঙ্গামাটির রাজবাড়ী বোটঘাট থেকে কমল কিষ্ঠ মেম্বারকে অপহরণ করে। তার বাড়ি হুদুকছড়ির তৈমেদুং গ্রামে। এখন পর্যন্ত তার কোন খোঁজ খবর মেলেনি। ধারণা করা হয় সন্ত্রাসীরা তাকে খুন করেছে। ঘটনার পর পরই জেএসএস-এর রাঙ্গামাটি অফিসে অবহিত করা হয়। কিন্তু তাতে কোন কাজ হয়নি।

সম্বিধ চাকমা (তুধিল)

গত ৮ জানুয়ারি ২০০২ সন্তু সন্ত্রাসীরা খাগড়াছড়ি বাজারের অনতিদূরে সাতভেইয়া পাড়া দোকান থেকে সম্বিধ চাকমা ওরফে তুধিলকে (২০) অপহরণ করে নিয়ে যায়। পরে সন্ত্রাসীরা তাকে খুন করে। ১৯শে জানুয়ারি তন্যামাছড়া থুম থেকে তার গলা কাটা লাশ উদ্ধার করা হয়। ঠিক একই জায়গায় জেএসএস সন্ত্রাসীরা কৃষি গবেষণার সুকুমার চাকমাকে নির্বাচনের কয়েকদিন আগে খুন করেছিল।

ঘটনার দিন সম্বিধ চাকমা খাগড়াছড়ি বাজার থেকে হরিনাথ পাড়ায় বাড়ি ফিরছিলেন। পথে তিনি গ্রামের কাছে সাত ভেইয়া পাড়ায় অবস্থিত অগ্য মারমার দোকানের কাছাকাছি পৌঁছলে জেএসএস সন্ত্রাসী সুকৃতি বিকাশ, রবীন্দ্র ও নয়নজ্যোতি তাকে কথা আছে বলে ডেকে নিয়ে যায়। এদের মধ্যে সুকৃতি বিকাশ সম্পর্কে তার কাকা হয় এবং তাকে সারেন্ডারের আগে এক সময় শান্তিবাহিনীর সদস্যরা মেরে ফেলার পরিকল্পনা নেয়। কিন্তু তুধিলদের পরিবারের প্রতিবাদের কারণে তখন সে পরিকল্পনা বাস্তবায়ন হয়নি। সে আর্মিদের পক্ষ হয়ে গুপ্তচর বৃত্তি করতো এবং সেনাসৃষ্ট মুখোশ বাহিনীরও সদস্য ছিল। বর্তমানে সে জেএসএস এর একজন সক্রিয় সদস্য।

সন্ত্রাসীরা তুধিলকে ডেকে নিয়ে যায় নিকটে অপেক্ষারত একটি সশস্ত্র সন্ত্রাসী দলের কাছে। এরপর তারা তাকে অস্ত্রের মুখে গভীর জঙ্গলে নিয়ে যায়। পরে তারা তাকে খুন করে। তার গলা ও হাত

২য় পাতায় দেখুন

সম্পাদকীয়

স্বাধিকার ❑ ১০ এপ্রিল ২০০২ ❑ বুলেটিন নং ২০

সম্পাদকীয়

জনসংহতি সমিতির নির্বাচনে কৃতকর্মের ফলভোগ

আমাদের অগণিত পাঠক ও জনগণের প্রতি বৈসাবি ও নববর্ষের শুভেচ্ছা। স্বাধিকারের সর্বশেষ সংখ্যা বের হয়েছিল গত বছর অক্টোবরে অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচনের প্রাক্কালে। এখন থেকে ছয় মাসের অধিক সময় আগে। এই সময়ের মধ্যে পার্বত্য চট্টগ্রামের রাজনীতিতে কিছু গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটে গেছে। প্রথমত, এই নির্বাচনে ইউপিডিএফ ও জেএসএস দুইটি পরস্পর বিপরীত রণকৌশল নিয়ে জনগণের সামনে আবির্ভূত হয়। ইউপিডিএফ সামগ্রিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে নির্বাচনে সরাসরি অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। অপরদিকে জেএসএস মুখে নির্বাচন বর্জন ও প্রতিহত করার কথা বললেও গোপনে বিএনপি প্রার্থীদের প্রতি সমর্থন জানায়। জেএসএস-এর এই নীতিহীনতা তথা দ্বিমুখী নীতিকে পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণ ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেন এবং ইউপিডিএফ-এর সঠিক, যুগোপযোগী ও বাস্তবসম্মত নির্বাচনী কৌশলের প্রতি তাদের ঐতিহাসিক রায় দেন। জেএসএস-এর নির্বাচন প্রতিহত করার ডাকে কেউ সাড়া দেয়নি। ফলে জেএসএস রাজনৈতিকভাবে কোণঠাসা ও পুরোমাত্রায় জনবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। অপরদিকে ইউপিডিএফ একটি গণতান্ত্রিক আঞ্চলিক রাজনৈতিক দল হিসেবে পার্বত্য চট্টগ্রামসহ সারা দেশে নিজের স্থান পোক্ত করে নিতে সক্ষম হয়।

দ্বিতীয়ত, অক্টোবরের এই নির্বাচনের মাধ্যমে বিএনপি'র নেতৃত্বাধীন চার দলীয় দক্ষিণপন্থী জোট সরকার গঠন করে। পার্বত্য চট্টগ্রামের তিনটি আসনের দু'টিতে বিএনপি জয়লাভ করে। ক্ষমতার মসনদে পালাবদল পার্বত্য চট্টগ্রামের রাজনীতিতেও প্রভাব ফেলে। ভোলানাথের মতো হিসেবের অংকে ভুল হওয়ায় সবচেয়ে বেশী বেকায়দায় পড়ে জনসংহতি সমিতি। সমিতির নেতৃবৃন্দ চেয়েছিলেন আওয়ামী লীগ কেন্দ্রে সরকার গঠন করুক, তবে পার্বত্য চট্টগ্রামের তিন আসনে বিএনপি জয়লাভ করুক। তাদের এই উদ্ভট চাওয়ার পেছনে কারণ রয়েছে। এক. বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে জেএসএস নেতৃবৃন্দ তিন পার্বত্য আওয়ামী এমপিদের দ্বারা অত্যন্ত ত্যক্ত বিরক্ত হন। দুই. জেএসএস নেতৃবৃন্দ অনেক চেষ্টার পরও আওয়ামী লীগের সাথে আগের মতো নির্বাচনী সমঝোতায় পৌঁছতে ব্যর্থ হন। আওয়ামী লীগ তাদেরকে তিন পার্বত্য জেলার একটি আসনও ছেড়ে দিতে রাজী হয়নি। সেজন্য মনের দুঃখে জেএসএস নেতৃবৃন্দ পার্বত্য চট্টগ্রামে তাদের মিত্র শক্তি আওয়ামী লীগের ভরাডুবি ঘটাতে উঠে পড়ে লেগে যান। নির্বাচনের কয়েকদিন আগে সন্তু লারমা ঢাকায় বিএনপি নেতৃবৃন্দের সাথে দেখা করে মৌখিক চুক্তিতে উপনীত হন। ন্যায়সঙ্গতভাবে ধারণা করা যায় এই মৌখিক চুক্তির একটি অংশ হচ্ছে নির্বাচনে পার্বত্য চট্টগ্রামের তিন আসনে যাতে বিএনপি জিততে পারে সেজন্য জেএসএস সর্বাত্মক সহযোগিতা দেবে। আসলে চুপিসারে জনগণকে না জানিয়ে মৌখিক চুক্তি করা সন্তু লারমাদের রেওয়াজে পরিণত হয়েছে।

যাই হোক, বৌদ্ধ শাস্ত্রে কর্মফলের কথা বলা হয়েছে। সন্তু লারমা ও তার সমিতিকে এখন তাদের কৃত কর্মের ফল ভোগ করতে হচ্ছে। প্রথম ফল-ভোগ হয় নির্বাচনে জনগণ কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হওয়ার মধ্য দিয়ে। এরপরেও তাদের ফল-ভোগ অব্যাহত রয়েছে। সন্তু লারমা আবার অভিযোগ করছেন বিএনপি জোট সরকার তার সমিতির সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। শুরু থেকেই নতুন সরকার চুক্তি লঙ্ঘন করেছে। একজন "উপজাতীয়কে" পার্বত্য মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী নিয়োগ দেয়নি। সন্তু বাবুদের পক্ষ থেকে জোর লবিং (অর্থাৎ দালালি) করার পরও সরকার তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের সবকটি আসনে নিজের দলের লোকদের মনোনয়ন দিয়েছে। সর্বোপরি চুক্তি মোতাবেক একজন "যোগ্য উপজাতীয়কে" উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান করা হয়নি। এত অপমানের পরও জেএসএস নেতৃবৃন্দকে গদি হারানোর ভয়ে সবকিছু হজম করতে হচ্ছে। সরকারের যথাযথ কর্তৃপক্ষের সম্মতিতে মৃদু প্রতিবাদ জানিয়ে জনগণের সামনে নিজেদের "মহাসংগ্রামী" চেহারা রক্ষার চেষ্টা চালিয়ে যেতে হচ্ছে। এক কথায়, প্রতারিত হতে হতে জেএসএস নেতৃবৃন্দের এখন মহা করুণ অবস্থা হয়েছে। এর থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার কোন সম্ভাবনা তাদের সামনে দেখা যাচ্ছে না।

তৃতীয় যে পরিবর্তন তা হচ্ছে জনগণের সকল অংশের মধ্যে এটা পরিষ্কার হয়েছে যে নিজেদের শক্তিশালী একটি রাজনৈতিক দল ছাড়া জনগণের ভাগ্য পরিবর্তন করা যাবে না। আওয়ামী লীগ, বিএনপির মতো দলগুলোর স্বার্থ আর পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের স্বার্থ এক নয়। এই দলগুলোর মনোনয়ন নিয়ে নির্বাচিত হলেও পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের স্বার্থে সামান্যতম কাজও করা যায় না। সাধারণ জনগণের এই উপলব্ধি একটি ইতিবাচক দিক। কারণ আওয়ামী লীগ, বিএনপির মতো গণবিরোধী দলগুলোর প্রতি মিথ্যা মোহ থাকলে প্রকৃত আন্দোলন গড়ে তোলা সম্ভব নয়।

কাজেই বর্তমান বিএনপি সরকার কিংবা বিএনপি-জামাত-ইসলামী ঐক্যজোটের মনোনীত প্রার্থী হয়ে রাঙ্গামাটি আসন থেকে নির্বাচিত সংসদ সদস্যের কাছ থেকে পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের আশা করার কিছু নেই। এমন কি সন্ত্রাস, নির্যাতন, মাস্তানতন্ত্র, কালাকানুন ছাড়া এ সরকারের কাছ থেকে দেশের জনগণেরও পাওয়ার কিছু নেই। সেজন্য জনগণের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য দরকার ব্যাপক গণআন্দোলন। বর্তমান অবস্থায় পার্বত্য চট্টগ্রামে গণ আন্দোলন গড়ে তোলার একটি অন্যতম শর্ত হচ্ছে ইউপিডিএফ ও জেএসএস-এর মধ্যে ঐক্য। এই সত্য জেএসএস নেতৃবৃন্দ যত শীঘ্র বুঝতে পারবেন, ততই মঙ্গল।

চিঠিপত্র

জেএসএস-কে প্রতিরোধ করুন

২ ডিসেম্বর ১৯৯৭ ঢাকায় সন্তু লারমার আত্মসমর্পনের দলিলে স্বাক্ষরের পর তিন বছর পেরিয়ে গেলো। অভাগা জুম্মোদের দুঃখ দুর্দশা ও লাঞ্ছনা বঞ্চনারও যেন অবসান হবার লক্ষণ নেই। নেই সন্তু লারমার আত্মঘাতি জাতিবিধ্বংসী কার্যকলাপের কোন বিরতি। বরং তিনি ইউপিডিএফ-এর সদস্যদেরকে গলাটিপে হত্যা করার, চোখ উপড়ে ফেলে দেবার, হাত পা ভেঙে দেবার নির্দেশ দিয়েছেন [যুগান্তর ১৩ নভেম্বর ২০০০]। সন্তু লারমার এটা কথার কথা নয়। এই নির্দেশ বাস্তবে প্রয়োগ হচ্ছে। ফলে জেএসএস-এর হাতে এ যাবত ইউপিডিএফ-এর ৪৫ জন নেতাকর্মি খুন হয়েছে এবং এই সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। অথচ তা সত্বেও ইউপিডিএফ বার বার সমঝোতার ডাক দিয়ে যাচ্ছে।

ইউপিডিএফ-এর প্রতি আমার আহ্বান: সমঝোতার ডাক আর নয়, জনতার জাগ্রত বিবেককে এদের প্রতিরোধের সুযোগ দিন। ঘোষণা করুন বৃহত্তর আন্দোলনের কর্মসূচী।

স্বাধিকার হয়ে উঠুক আন্দোলনের অগ্নিঝরা দিনগুলোর প্রতিচ্ছবি আর মুক্তিকামী নিপীড়িত জনতার বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর। এই শুভ কামনায়।

তুজিম চাকমা
বড়াদম, দিঘীনালা
৬ জুন, ২০০১

অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচন: পার্বত্য চট্টগ্রাম প্রেক্ষিতে একটি মূল্যায়ন

সত্যদর্শী

গত বছর ১লা অক্টোবর অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পর প্রায় সাড়ে ছয় মাস অতিক্রান্ত হয়েছে। এই নির্বাচনে ইউপিডিএফ পার্বত্য চট্টগ্রামের তিনটি আসনের দু'টিতে নিজেদের দলের প্রার্থী দিয়ে সরাসরি অংশগ্রহণ করে। অপরদিকে, জনসংহতি সমিতি নির্বাচন বয়কট ও প্রতিহত করার ডাক দিলেও গোপনে বিএনপি প্রার্থীদের সমর্থন জানায়। ফলে তাদের নির্বাচন বয়কট শেষ পর্যন্ত ইউপিডিএফ ঠেকানোর কৌশলে পর্যবসিত হয়।

অনেক দিক দিয়ে এই নির্বাচন পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের জন্য গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। সেজন্য দেরীতে হলেও এই নির্বাচন একটি যথাযথ ও নৈর্ব্যক্তিক মূল্যায়নের দাবি রাখে। প্রথমত, পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণ জনসংহতি সমিতির "বয়কট ও প্রতিহত" করার কৌশল আগাগোড়া প্রত্যাখ্যান করে। বিভিন্ন জায়গায় জেএসএস-এর সশস্ত্র কর্মিরা ভোট না দেয়ার জন্য হুমকি দিলেও সাধারণ ভোটাররা তাদের কথায় কর্ণপাত করেনি। তবে খাগড়াছড়ির বেশ কিছু এলাকায় ভোটের দিন সন্ত্রাসীরা লোকজনকে ভোট কেন্দ্রে যেতে বাধা দেয়। প্রধানত যে জায়গায় ইউপিডিএফ-এর সমর্থক বেশী সে সব এলাকায় এ ধরনের বাধা প্রদানের ঘটনা ঘটে। আসলে বয়কট ও প্রতিহত করার কথা বললেও জনসংহতি সমিতি নির্বাচনে দ্বিমুখী ভূমিকা গ্রহণ করে, যা তাদের কৌশল সম্পর্কে সাধারণ জনগণের মধ্যে বিভ্রান্তির জন্ম দেয়। ফলে জনগণ সম্পূর্ণভাবে জেএসএস-এর দ্বিমুখী নীতি প্রত্যাখ্যান করে ইউপিডিএফ-এর সঠিক, সময়োপযোগী ও বাস্তব পরিস্থিতির আলোকে গৃহীত নির্বাচনী কৌশলের প্রতি দ্ব্যর্থহীনভাবে সমর্থন জানায়। নির্বাচনে অংশগ্রহণের কৌশল যে সঠিক ও বাস্তবসম্মত তা নির্বাচনের আগেও জনগণের মাঝে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সেজন্য নির্বাচনী প্রচারণায় ইউপিডিএফ ব্যাপক গণ জাগরণ সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়। অপরদিকে, জনসংহতি সমিতি জনবিচ্ছিন্ন ও দিক বিদিক জ্ঞানশুন্য হয়ে ইউপিডিএফ-কে মোকাবিলার জন্য সন্ত্রাসের আশ্রয় নেয়। প্রাক নির্বাচনী সময়ে পিসিপি'র প্রাক্তন সভাপতি রূপক চাকমাসহ ইউপিডিএফ-এর অন্ততঃ পাঁচজন কর্মি ও সমর্থককে তারা খুন করে।

দ্বিতীয়ত, জেএসএস-এর তথাকথিত নির্বাচন বয়কট ও প্রতিহত করার কৌশল বিএনপিকেই লাভবান করে। জনসংহতি সমিতি নিজেও তা দাবি করে। বিএনপি পার্বত্য চট্টগ্রামের তিনটি আসনের দুটিতে জয়লাভ করে। তৃতীয়ত, জেএসএস-এর বয়কট ও প্রতিহত করার কৌশল ও সন্ত্রাসী কার্যকলাপ তাদেরকে জনগণের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করে। সাধারণ জনগণ এমনকি আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কাছে জেএসএস-এর ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন হয় চরমভাবে। পার্বত্য চট্টগ্রাম কমিশন তাদের সন্ত্রাসী কর্মকান্ডে উদ্বিগ্ন হয়ে একটি খোলাচিঠি প্রচার করে। নির্বাচন বয়কট ও প্রতিহত করার কৌশল নিয়ে জেএসএস যে লাভবান হয়নি তা তারা নিজেরাই স্বীকার করেছেন।

অপরদিকে, নির্বাচনে অংশগ্রহণের মাধ্যমে ইউপিডিএফ জনগণের মধ্যে ব্যাপক প্রচারণা চালাতে সক্ষম হয়। নির্বাচনকে ঘিরে ব্যাপক গণজোয়ার সৃষ্টি হয়। পার্টির বক্তব্যকে পাহাড়ি বাঙালি ব্যাপক জনগণের কাছে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়। ফলে জনগণের সাথে পার্টির সংযোগ ও একাত্মতা গড়ে ওঠে। ইউপিডিএফ নির্বাচনকে ব্যবহার করে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করতে পেরেছে, যে অধিকার থেকে পার্টিকে এতদিন ধরে বঞ্চিত করে রাখা হয়েছিল।

চতুর্থত, ইউপিডিএফ নেতারা প্রথম থেকেই অসুবিধাজনক অবস্থান থেকে নির্বাচনী লড়াই চালাতে বাধ্য হন। তারা স্বাধীন ও অবাধে নির্বাচনী কাজ চালাতে পারেননি। নির্বাচনে ইউপিডিএফ-এর একমাত্র প্রার্থী প্রসিত খীসা বলতে গেলে কেবলমাত্র খাগড়াছড়িতে একটি জনসভায় উপস্থিত থাকতে সক্ষম হন। রাঙামাটিতে কাউখালী ছাড়া আর কোন জায়গায় উল্লেখ করার মতো সমাবেশ করা যায়নি। জেএসএস-এর সশস্ত্র সদস্যরা প্রতিনিয়তই ইউপিডিএফ-কে নির্বাচনী প্রচারণায় বাধা প্রদান করে। তারা গাড়ীর বহরে লক্ষ্য করে গুলি চালিয়ে ইউপিডিএফ-এর কর্মি ও সমর্থকদের খুন করে। তাছাড়া ইউপিডিএফ-কে জেএসএস ছাড়াও আরো অনেক পক্ষকে মোকাবিলা করতে হয়েছে। প্রশাসনের একটি অংশ ছিল প্রথম থেকেই বৈরী ভাবাপন্ন। অপরদিকে সেনাবাহিনী প্রথম থেকে নির্বাচনের দিন পর্যন্ত নানাভাবে বিএনপি'র পক্ষ অবলম্বন করে। মাটিরাঙ্গা ও রামগড়ে তারা প্রকাশ্যে বিএনপি প্রার্থী ওয়াদুদ ভূঁইয়ার পক্ষে প্রচারণা চালায়। এছাড়া রয়েছে কিছু দালাল শ্রেণী, যারা নির্বাচনে ব্যক্তিগতভাবে আর্থিক সুবিধা হাসিলের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন মহল দ্বারা ব্যবহৃত হয়। নির্বাচন এলেই এদের সুবিধা হাসিলের মৌসুম শুরু হয়ে যায়। ইউপিডিএফ-কে এদের বিরুদ্ধেও লড়তে হয়েছে। জনগণের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দিতে হয়েছে।

পঞ্চমত, নির্বাচনে অংশগ্রহণের আরেকটি সুফল হচ্ছে খাগড়াছড়িতে সমাজবিরোধী মাদকসেবীদের দৌরাত্ম্য ব্যাপকভাবে খর্ব হয়। দীর্ঘদিন ধরে এরা জেএসএস-এর মদদ ও সহযোগিতা পেয়ে খাগড়াছড়ি শহরের বিভিন্ন জায়গায় ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে বসেছিল। এলাকার লোকজন তাদের অপকর্মের বিরুদ্ধে টু শব্দটি পর্যন্ত করতে পারতো না। তাদের গাজা হিরোইন কেনার টাকা জেএসএস-এর পক্ষে সব সময় মিটিয়ে দেয়া সম্ভব না হলে তারা সে টাকা সাধারণ জনগণের কাছ থেকে আদায় করতো। এমনকি খেটে খাওয়া রিক্সা চালকরাও তাদের সন্ত্রাসী থাবা থেকে বাদ যেতো না। খাগড়াছড়ির রিক্সাচালকরা এদের ভয়ে দিনের বেলায়ও শহরের কয়েকটি এলাকায় যেতেন না। এক কথায়, জেএসএস মদদপুষ্ঠ মাদকসেবীদের উৎপাতে খাগড়াছড়ির জনগণ ছিলেন অতিষ্ঠ। ইউপিডিএফ কর্তৃক নির্বাচনে অংশগ্রহণের ফলে এই পরিস্থিতি পাল্টে যায়। শহরের বিভিন্ন জায়গায় থাকা তাদের আস্তানা থেকে পালিয়ে গিয়ে তারা শেষ পর্যন্ত মহাজন পাড়াস্থ জেএসএস অফিসে গিয়ে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়। অনেকে কৃত কর্মের জন্য ভুল স্বীকার করে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসে। ইউপিডিএফ তাদের বিরুদ্ধে কোন ধরনের বলপ্রয়োগ করেনি। জনগণের গণতান্ত্রিক উত্থানের কারণেই তারা টিকতে পারেনি।

নির্বাচনের পর খাগড়াছড়িতে "মাদক বিরোধী ছাত্র ও যুব সমাজ" গঠন করা হয় ও মাদক বিরোধী প্রচারণা জোরদার করা হয়। সচেতন ছাত্র ও তরুণরাই মূলত এর উদ্যোক্তা। তাদের কার্যক্রম খাগড়াছড়িতে ব্যাপক সাড়া জাগায়। জেএসএস তাদের মাদক বিরোধী প্রচারণায় বাধা প্রদান করে। এমনকি মাদক বিরোধী ছাত্র যুব সমাজের আহ্বায়ককে অপহরণ করে নিয়ে যায় ও তাকে পদত্যাগের জন্য চাপ দেয়।

মোট কথা, ইউপিডিএফ কর্তৃক নির্বাচনে অংশগ্রহণের ফলে বহুমুখী সুফল পাওয়া যায়। জনগণ নির্বাচনে জেএসএস-এর দ্বিমুখী নীতিকে প্রত্যাখ্যান করে ও ইউপিডিএফ-এর নির্বাচনে অংশগ্রহণের যে কৌশল গ্রহণ করে তার পক্ষে স্বতঃস্ফূর্তভাবে রায় দেয়। সর্বোপরি জনগণ ছিলেন নির্বাচনের পক্ষে। নির্বাচন বয়কট করার মতো পরিস্থিতি পার্বত্য চট্টগ্রামে সৃষ্টি হয়নি। ফলে জনসংহতি সমিতির নির্বাচন বয়কট ও প্রতিহত করার কৌশল ছিল বাস্তবতা বিবর্জিত।

অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচন সবার জন্য ছিল একটি শিক্ষা। জেএসএস নিজেদের কৌশলে নিজেরাই ধরাশায়ী হয়েছে। এটাই তাদের সবচেয়ে বড় শিক্ষা। তবে তারা কখনো ইতিহাস থেকে শিক্ষা নেয় না। তারা কখনো বিনয়ী হয়ে নিজেদের ভুল স্বীকার করে না। এটা তাদের স্বভাব বিরুদ্ধ। অপরদিকে, আওয়ামী লীগসহ সুযোগ সন্ধানী দালাল শ্রেণীদেরকেও জনগণ উচিত শিক্ষা দিয়েছেন। জনগণ তাদেরকে বুঝিয়ে দিয়েছেন নির্বাচনে ডিগবাজী রাজনীতির পরিণাম কি। তবে যারা ধান্ধাবাজ দালাল তাদের লজ্জা শরম বলতে কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। ফলে তারাও যে জনগণের দেয়া শিক্ষা সহজভাবে গ্রহণ করবেন তা মনে করার কোন কারণ নেই।

সর্বোপরি, ইউপিডিএফ-ও এই নির্বাচন থেকে অনেক মূল্যবান শিক্ষা লাভ করেছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের ব্যাপক ও অধিকাংশ জনগণ যে সত্য ও সঠিক জিনিসটি সহজে বেছে নিতে পারেন তা নির্বাচনের মাধ্যমে আবার প্রমাণিত হয়েছে। সত্য ও ন্যায়ের পক্ষে থাকলে যে জনগণের সমর্থন, সহানুভূতি ও ভালবাসা লাভ করা যায় এবারের নির্বাচনে ইউপিডিএফ-এর প্রত্যেক নেতা কর্মি তা উপলব্ধি করেছেন।

নির্বাচনের সময় প্রকাশিত স্বাধিকাররের গত সংখ্যায় বলা হয়েছে, অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচন হচ্ছে ইউপিডিএফ-এর জন্য ড্রেস রিহার্সেল। এই রিহার্সেল আশাব্যঞ্জক সাফল্যতার সাথে সমাপ্ত হয়েছে। ভবিষ্যতে "স্টেজ পারফরমেন্সে" ইউপিডিএফ তার এই অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে জনগণের আশা আকাঙ্ক্ষার সার্থক প্রতিফলন ঘটাতে সক্ষম হবে - এটাই এখন সবার প্রত্যাশা। ❐

বহুজাতিক তেল-গ্যাস কোম্পানি: নাইজেরিয়া ও ইকুয়েডরের ক্ষুদ্র জাতিসত্তাসমূহের অভিজ্ঞতা এবং আমাদের শিক্ষা

রবিশংকর চাকমা

সেজন্য পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণকে অবশ্যই এ সম্পর্কে সচেতন এবং নিজেদের সম্পদ রক্ষার জন্য সচেষ্ট হতে হবে। বহুজাতিক তেল গ্যাস কোম্পানিগুলো জোঁকের মতো জেকে বসার আগেই প্রতিবাদ ও প্রতিরোধে সোচ্চার হতে হবে। তা না হলে নিজেদের সম্পদই নিজেদের কাল হয়ে দাঁড়াতে পারে।

বহুজাতিক তেল-গ্যাস কোম্পানিগুলোর তৎপরতা বর্তমান বিশ্বের বহুদেশে পরিবেশ, প্রাকৃতিক ভারসাম্য ও সংখ্যালঘু জাতিসত্তাগুলোর অস্তিত্বের জন্য এক ভয়াবহ হুমকির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। মুনাফা যেখানে একমাত্র লক্ষ্য ও চালিকাশক্তি, সেখানে কোম্পানিগুলোর জন্য অন্য কোন বিষয় আর বিবেচ্য থাকে না। সেজন্য তাদের মুনাফামুখী কার্যক্রমের প্রক্রিয়ায় ধ্বংস হয় পরিবেশ, উজার হয়ে যায় আমাজানের মতো বিশাল বনাঞ্চল, আর বিলুপ্ত কিংবা বিলুপ্তির দ্বারপ্রান্তে এসে দাঁড়ায় সংখ্যালঘু জাতিসমূহ।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বহুজাতিক তেল-গ্যাস কোম্পানিগুলো সম্পর্কে বিভিন্ন অভিযোগ রয়েছে। বক্ষ্যমান নিবন্ধে এই বহুজাতিক তেল-গ্যাস কোম্পানিগুলো সম্পর্কে নাইজেরিয়া ও ইকুয়েডরের সংখ্যালঘুদের অভিজ্ঞতা সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছে। এই আলোচনায় দেখা যাবে কিভাবে তেল গ্যাস কোম্পানিগুলোর মুনাফামুখী তৎপরতার কারণে সংখ্যালঘু জাতিসত্তাসমূহ নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত, এমনকি বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে।

নাইজেরিয়া

প্রথমে নাইজেরিয়ার ওগোনি জনগোষ্ঠির অভিজ্ঞতার কথা আলোচনা করা যাক। নাইজেরিয়া হচ্ছে তেল-গ্যাস সম্পদে সমৃদ্ধ আফ্রিকার একটি দেশ। ওগোনি জাতিসত্তার লোকজন বাস করেন রিভার্স স্টেট অঞ্চলের ওগোনি নামক এলাকায়। তাদের জনসংখ্যা আনুমানিক ৫ লাখ। ওগোনি অঞ্চলের আয়তন হচ্ছে মাত্র ৬৫০ কিলোমিটার। কিন্তু জনসংখ্যার ঘনত্ব সত্বেও নাইজার বদ্বীপের তুলনাহীন উর্বরতার জন্য ওগোনি জনগণ চাষাবাদ ও মৎস্য শিকারের মাধ্যমে আত্মনির্ভরতার সাথে জীবন ধারণ করতে সক্ষম হতেন। কিন্তু বর্তমানে তাদের এই জীবনযাত্রা হুমকির সম্মুখীন। ১৯৯২ সালে গঠিত ওগোনি জনগণের সংগঠন Movement for the Survival of the Ogoni People (MOSOP) এর এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে: একদা নয়নাভিরাম গ্রামীন সৌন্দর্য্য আর নেই, নেই নির্মল হাওয়া আর সবুজ বৃক্ষরাজি। সেখানে এখন কেবল মৃত্যুই দেখা ও অনুভব করা যায়।

১৯৫৮ সালে শেল কোম্পানি কর্তৃক তেল আবিস্কারের সাথে সাথে ওগোনি জাতিসত্তার অস্তিত্বের প্রতি হুমকি শুরু হয়। তখনো পর্যন্ত নাইজেরিয়া বৃটিশ উপনিবেশিক শাসনের অধীনে ছিল এবং সেজন্য তেল সম্পদ উত্তোলন ও ব্যবহারের ক্ষেত্রে ওগোনি জনগণের কোন মতামত ছিল না। নাইজেরিয়ায় শেল কোম্পানির কার্যক্রম শুরু হওয়ার পর কোম্পানিটি ওগোনি অঞ্চলের তেল থেকে আয় বাবদ প্রায় ৩০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার উপার্জন করে। কিন্তু তার বদলে ওগোনি জনগণ কি পেয়েছে? তাদের বর্তমান অবস্থা কি?

শেল কোম্পানির কার্যক্রমের ফলে বর্তমানে ওগোনি জাতিসত্তার অস্তিত্ব ভয়ানকভাবে হুমকির সম্মুখীন। কেবল মাত্র ওগোনি অঞ্চলে শতাধিক তেল কূপ রয়েছে, যার অধিকাংশই শেল কোম্পানির মালিকানাধীন। এই তেল কূপ খননের পরিবেশগত ফল হয়েছে খুবই মারাত্মক। ১৯৭৬ থেকে ১৯৯১ সালের মধ্যে নাইজার বদ্বীপের তিন হাজারটি পৃথক স্থানে তেল ছিটকে পড়ার (oil spills) ঘটনা ঘটে। প্রত্যেকটা থেকে গড় হারে ৭০০ ব্যারেল তেল মাটিতে পড়ে যায়। এর ফলে পরিবেশের ওপর অপূরণীয় ক্ষতি সাধিত হয়। জমির উর্বরতার ওপর ফেলে বিরূপ প্রভাব। কিন্তু এর প্রতি শেল কোম্পানির কোন ভ্রুক্ষেপ নেই।

গ্যাস উত্তোলনের সময় প্রায় ক্ষেত্রে দুর্ঘটনা ঘটে। পাইপ লাইন কিংবা গ্যাস কূপে বিস্ফোরণের ফলে অনেক সময় আগুন লেগে যায়। বেশ কিছু এলাকায় এই আগুন গত ত্রিশ বছর দিনরাত চব্বিশ ঘন্টা ধরে জ্বলছে। আর গ্যাস থেকে এ ধরনের অগ্নি বিস্ফোরণের ঘটনা প্রায়শ ঘটে ওগোনিদের গ্রামের আশে পাশে। ফলে গ্রামবাসীদেরকে সারাক্ষণ আগুন জ্বলার বিরক্তিকর আওয়াজ শুনে বাস করতে হয়। সারা এলাকা ঘন কালো ঝুলকালিতে ঢাকা পড়ে এবং বৃষ্টি হলে এই ঝুলকালিগুলো নদনদীর পানির সাথে মিশে গিয়ে পুরো এলাকা দূষিত করে ফেলে। সর্বক্ষণ গ্যাস জ্বলতে থাকার কারণে বাতাসও দূষিত হয়ে যায় এবং এর ফলে এসিড বৃষ্টি হয়। আশে পাশের জনগোষ্ঠির শ্বাসকষ্ট দেখা দেয়। শেল-এর পাইপ লাইনগুলো মাটির ওপরে গ্রামের ভেতর দিয়ে এবং ফসলের মাঠের ওপর দিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়।

শেল কোম্পানির তৎপরতা এবং নাইজেরিয়া সরকারের উদাসীনতার প্রতিবাদ করার জন্য ১৯৯২ সালে বিখ্যাত নাইজেরিয়ান লেখক Ken Saro-Wiwa এর নেতৃত্বে Movement for the Survival of the Ogoni People (MOSOP) বা "ওগোনি জনগণের অস্তিত্বের জন্য আন্দোলন" নামে একটি সংগঠনের জন্ম হয়। ওগোনিদের আন্দোলন সম্পর্কে তিনি বলেন: নাইজেরিয়ান সরকার ও শেল কোম্পানি গত ৩৫ বছর ধরে ওগোনি জনগণের সাথে প্রতারণা করেছে। ওগোনিরা এবার চূড়ান্ত অবস্থান গ্রহণ করেছে।" ১৯৯৩ সালের ৪ঠা জানুয়ারি ৩ লক্ষ ওগোনি নারী পুরুষ শেল ওয়েল কোম্পানি ও ওগোনি অঞ্চলের পরিবেশ ধ্বংসের বিরুদ্ধে শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ সংগঠিত করে। কিন্তু সরকার ও শেল কোম্পানি ওগোনিদের এই ন্যায়সংগত প্রতিবাদকে সহজভাবে নেয়নি। শুরু হয় দমন পীড়ন। প্রতিবাদ করার সময় ওগোনিদের ওপর গুলি চালানো হয় ও বিভিন্নভাবে তাদেরকে হয়রানি করা হয়। হাজার হাজার ওগোনিকে আটক করা হয়। কয়েক বছরের মধ্যে শত শত ওগোনিকে খুন করা হয়। শেল কোম্পানি ওগোনিদের ওপর অত্যাচারের সাথে সরাসরি জড়িত। কেবল মাত্র ওগোনি জনগণের আন্দোলন দমনের জন্য শেল কোম্পানি তাদের নিজস্ব পুলিশ বাহিনী গঠন করে। ওগোনিদের ওপর আক্রমণ চালানোর ক্ষেত্রে শেল কোম্পানি যে নাইজেরিয়ান সরকারের সাথে মিলে ষড়যন্ত্র করেছে তার বহু প্রমাণ রয়েছে। প্রতিবাদ সংগঠিত করতে নেতৃত্ব দেয়ার কারণে ক্যান সারো উইবা শেল কোম্পানি ও নাইজেরিয়ান সরকারের প্রধান টার্গেটে পরিণত হন। তাকে নিভিন্নভাবে নাজেহাল ও হয়রানি করা হয়। একবার তাকে কোন প্রকার অভিযোগ ছাড়াই পোর্ট হারকোর্ট এয়ারপোর্টে ১৬ ঘন্টা আটক রাখা হয়েছিল। ওগোনি জনগণের প্রতিবাদ অব্যাহত থাকলে ক্যান সারো উইবার বিরুদ্ধে হয়রানিমূলক রাষ্ট্রবিরোধী মামলা ঝুলিয়ে দেয়া হয়। ১৯৯৫ সালের ৩১শে অক্টোবর এক প্রহসনমূলক বিচারে অন্য আটজন সহঅভিযুক্তদের সহ তার বিরুদ্ধে মৃত্যু দণ্ডাদেশ দেয়া হয়। সাথে সাথে এর বিরুদ্ধে বিশ্বব্যাপী প্রতিবাদের ঝড় ওঠে। কিন্তু তা সত্বেও সরকার এই মৃত্যুদণ্ডাদেশ কার্যকর করে।

সুতরাং কোন দেশে বা অঞ্চলে সম্পদ থাকলেই যে জনগণের উন্নয়ন হবে তার কোন গ্যারান্টি নেই। এক্ষেত্রে দেখতে হবে এই সম্পদ ও উৎপাদনের উপায় সমূহের উপর কার নিয়ন্ত্রণ রয়েছে। জনগণের প্রকৃত উন্নয়ন তখনই সম্ভব যখন এই সকল সম্পদ ও উৎপাদনের উপায় সমূহের ওপর জনগণের মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয়।

ইকুয়েডর

ল্যাতিন আমেরিকার দেশ ইকুয়েডরের সংখ্যালঘু জাতিসত্তাগুলোর অবস্থা আরো ভয়াবহ। সেখানে তেল গ্যাস কোম্পানিগুলোর তৎপরতার কারণে ৯০ দশকের মধ্যেই তেতেতি জাতিসত্তা (Tetete nation) একেবারে বিলুপ্ত হয়ে গেছে। আরো অনেক জাতিসত্তা যেমন হুয়াওরানি, জাপারা, কোফান, সাইয়োনা এবং সিকোয়া এখন প্রায় বিলুপ্তির পথে। এমনকি ১৯৯১ সালের এক সমীক্ষায় বিশ্ব ব্যাংক স্বীকার করেছে যে, কোফান জাতিরা 'সাংস্কৃতিকভাবে বিলুপ্ত হওয়ার কাছাকাছি' এসে দাঁড়িয়েছে।

তেল-গ্যাস সংক্রান্ত কার্যক্রমের জন্য সংখ্যালঘু জাতিসত্তাসমূহের এলাকায় আগমণ ঘটে বহিরাগত বা সেটলারদের। সংখ্যালঘু জাতিসত্তার একটি অঞ্চল হচ্ছে ওরিয়েনটি (Oriente)। সেখানে তেল উত্তোলনের আগেই পুরো জঙ্গল জুড়ে শত শত রাস্তাঘাট খোড়া হয় এবং এভাবে সেখানে জনবহুল সমুদ্র তীরবর্তী এলাকা থেকে আড়াই লক্ষ বহিরাগত মেস্তিজো জনগোষ্ঠির লোকজনের (স্প্যানিশ ও আদিবাসী মিশ্রিত লোকজন) আগমণ ঘটে। এরফলে স্থানীয় জাতিসত্তার লোকজন নিজের এলাকায় সংখ্যালঘুতে পরিণত হয়।

তেল কোম্পানিগুলোর কার্যক্রমের পরিবেশগত ফল হয় অত্যন্ত ভয়াবহ। আমেরিকান কোম্পানি টেক্সাকো (Texaco) সান কার্লোস মিউনিসিপ্যালিটিতে ৩০টি তেল কূপ খনন করে এবং শহরের অনতিদূরে একটি শোধনাগার নির্মাণ করে। এই তেলকূপ থেকে উত্তোলিত প্রতি ব্যারেল তেলের সাথে থাকে অন্য এক ব্যারেল বিষাক্ত পানি। এই বিষাক্ত আবর্জনা মাটির নীচে চাপা দেয়ার কথা থাকলেও টেক্সাকো সেগুলো জঙ্গলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা ডোবায় ফেলে দেয়। এই ডোবাগুলো বিষাক্ত আবর্জনায় পূর্ণ হয়ে গেলে কোম্পানিটি সেগুলো আশেপাশের খাল বিলে অথবা রাস্তাঘাটে ফেলে দেয়ার জন্য স্থানীয় লোকজনদের নিয়োগ করে। ছোটো ছোটো বাচ্চা ছেলেরা এই বিষাক্ত পানি প্লাবিত রাস্তাঘাটে খালি পায়ে খেলা করে এবং পেট্রল দিয়ে তাদের পা ধুইয়ে ফেলে। অনেক সময় বিষাক্ত আবর্জনাগুলো পুড়িয়ে ফেলা হয়। পোড়ানো হলে এর থেকে যে ঘন কালো ধোঁয়া বের হয় তা পুরো আকাশ ছেয়ে ফেলে। এর ফলে যখন বৃষ্টি হয় তখন সেই বৃষ্টির পানিও কালো হয়ে যায়।

ডোবা নর্দমায় ফেলে দেয়া বিষাক্ত আবর্জনা হ্রদে, নদীতে এবং এমনকি ভূগর্ভস্থ পানিতে ছড়িয়ে পড়ে। এর ফলে সান কার্লোসের অধিবাসীরা যে সব উৎস থেকে খাবার পানি সংগ্রহ করে বা যেখানে গোসল করে সেগুলোতে পেট্রোলিয়াম হাইড্রোকার্বন নামক বিষাক্ত পদার্থ মিশে যায়। এসব পানি ব্যবহারের ফলে নানাধরনের রোগ ব্যাধি দেখা দেয়। ১৯৯৯ সালে ইউনিভার্সিটি অব লন্ডন সান কার্লোস এলাকায় যে সমীক্ষা চালায় তাতে দেখা যায় সেখানে ক্যান্সার আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা অন্যান্য এলাকার তুলায় বহুগুণ বেশী। অন্য এক রিপোর্টে এই বিষাক্ত আবর্জনা ও পরিবেশ দূষণ থেকে যে সব রোগ ছড়িয়ে পড়ে তার তালিকা দেয়া হয়েছে। এইসব রোগের মধ্যে ত্বকের প্রদাহ, একজিমা, স্কিন ক্যান্সার, শ্বাসকষ্ট, স্নায়ু দৌর্বল্য, গর্ভপাত, ফুসফুস প্রদাহ, চক্ষু রোগ, ব্রেন টিউমার, রক্ত স্বল্পতা ইত্যাদি। এক কথায়, সান কার্লোস ও ওরিয়েন্টে অঞ্চল এখন বিষাক্ত। নিঃশ্বাসের সাথে, পানির সাথে, এমনকি খাদ্য দ্রব্যের সাথে শরীরে বিষ ঢুকে পড়ে। স্থায়ী অধিবাসী কিংবা সেটলার সবাই এই বিষাক্ত পরিবেশের শিকার। ইউরোপ ভিত্তিক "এডভোকেসি প্রজেক্ট" নামের একটি সংগঠনের প্রতিনিধি ইকুয়েডরের ঐ এলাকা সফর করেন। সফরে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সংগঠনটি একটি ধারাবাহিক রিপোর্ট প্রকাশ করে। হুগো উরেনা নামে রিপোর্টে উল্লেখিত সান কার্লোসের একজন স্থানীয় নেতা জানায়, "আমরা মাথা ও গলা ব্যাথায় ভুগছি। আমাদের শিশুরা বিকলাঙ্গ হয়ে জন্মায়"। তিনি আরো বলেন, সান কার্লোস কখনোই এ রকম ছিল না। যখন ৩০ বছর আগে টেক্সাকো প্রথম আসে, তখন লোকজন ভেবেছিল এতে তাদের উন্নতি হবে। তারা ভালো চাকুরী পাবে, অনেক অর্থ উপার্জন করবে, তাদের ছেলেমেয়েরা ভালো স্কুলে পড়াশুনা করতে পারবে এবং তারা ভালো বাড়িঘরে থাকতে পারবে। হুগো উরেনার বাবাও কয়েক বছর আগে ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে মারা যান। তিনি জানান, চারটি গ্যাস-বার্নার এলাকায় রাতদিন জ্বলছে। এর থেকে যে ধোঁয়া বের হয় তার সাথে থাকে সালফার ও অন্যান্য বিষাক্ত পদার্থ। এগুলো বাতাসের সাথে মিশে যায়। তেল কোম্পানিগুলো এখনো বিষাক্ত পদার্থ যত্রতত্র ফেলে দিচ্ছে। ফলে আমাদের লোকজন এবং পশুগুলো অসুস্থ হয়ে পড়ছে।

পরিবেশ দূষণ এখন এমন মারাত্মক অবস্থায় পৌঁছে গেছে যে, উত্তর ওরিয়েন্টে এলাকার লোকজনের পক্ষে আর কোনভাবেই বিষ পরিবহার করে চলা সম্ভব নয়। বৃষ্টির পানিকে সবচেয়ে বিশুদ্ধ মনে করে তা তারা ধরে রাখে এবং সেই পানি তারা খাবার পানি ও গোসলের পানি হিসেবে ব্যবহার করে। কিন্তু তাদেরকে এই বৃষ্টির পানি ধরে রাখতে হয় ফেলে দেয়া তেলের ব্যারেলে, যা ইতিমধ্যেই বিপজ্জনক পদার্থে বিষাক্ত হয়ে আছে। লোকজন যে মাছ খায় সেই মাছে এবং যে প্রাণী শিকার করে সেই প্রাণীর টিস্যুতেও রয়েছে বিষ।

আমাদের শিক্ষা

নাইজেরিয়া ও ইকুয়েডরের সংখ্যালঘু জাতিসমূহের এই তিক্ত অভিজ্ঞতা থেকে আমাদেরকে শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। পার্বত্য চট্টগ্রাম হচ্ছে তেল গ্যাস সম্পদে সমৃদ্ধ একটি অঞ্চল। Energy Crisis and Subregional Cooperation in South Asia তে অনসূয়া বসু রায় চৌধুরী লিখেছেন, "However, the concerned experts have indicated that Tripura and some other northeast Indian states have enough stock of natural gas. It has been pointed out too that the Chittagong Hill Tracts (CHT) and the adjoining areas are also floating on gas". (RCSS Policy Studies). *অর্থাৎ সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞদের মতে, ত্রিপুরা এবং অন্য কয়েকটি উত্তরপূর্ব ভারতীয় রাজ্যে যথেষ্ট পরিমাণ প্রাকৃতিক গ্যাস মজুত রয়েছে। এর সাথে এটাও নির্দেশ করা হয়েছে যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম এবং এর পার্শ্ববর্তী অঞ্চলসমূহ গ্যাসের ওপর ভাসছে।*

পার্বত্য চট্টগ্রাম সহ উত্তরপূর্ব ভারতের এই প্রাকৃতিক গ্যাস সম্পদ লুণ্ঠনের জন্য বহুজাতিক কোম্পানিগুলো অনেক আগে থেকে তৎপরতা চালিয়ে আসছে। ইউনাইটেড মেরিডিয়ান কর্পোরেশন নামে একটি মার্কিন কোম্পানি চুক্তির পর পর তেল গ্রাস অনুসন্ধানের লক্ষ্যে সারা পার্বত্য চট্টগ্রামে ভূতাত্বিক জরিপ চালায়। পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের কোন মতামত না নিয়ে সরকার এই কোম্পানিটির সাথে উৎপাদন বণ্টন চুক্তি সম্পাদন করে। অন্য একটি মার্কিন কোম্পানি ওসান এনার্জি অচিরেই তেলকূপ খনন করবে বলে সম্প্রতি পত্রিকায় রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়া বৃটিশ বহুজাতিক তেল কোম্পানি কেয়ার্ন এনার্জি মানিকছড়ির যোগ্যছলা নামক এলাকায় গ্যাস উৎপাদন প্রক্রিয়া শুরু করে দিয়েছে। বহুজাতিক কোম্পানিগুলোর এই প্রাকৃতিক সম্পদ লুণ্ঠনের ক্ষেত্র প্রস্তুত করার জন্য একটি বিশেষ মহল থেকে রূপকথার গল্পের মতো উন্নয়নের ঘুম পাড়ানি গান শোনানো হচ্ছে। কিন্তু আমরা যদি নাইজেরিয়া ও ইকুয়েডরের সংখ্যালঘু জাতিদের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিই তাহলে উন্নয়নের এই গালভারি কথায় বিশ্বাস স্থাপন করা সম্ভব নয়। বরং বহুজাতিক কোম্পানিগুলোর ষড়যন্ত্র ও তৎপরতায় আমাদের নিজেদের জাতীয় অস্তিত্ব যে চরমভাবে বিপন্ন হতে পারে - সে সম্পর্কে উদ্বিগ্ন না হয়ে পারা যায় না।

বহুজাতিক তেল গ্যাস কোম্পানিগুলো চালিত হয় মুনাফাকে কেন্দ্র করে। যেখানে মুনাফা অর্জনের সম্ভাবনা সেখানেই তারা বিনিয়োগ করে থাকে। আর মুনাফা অর্জনের স্বার্থে যদি কোন ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠি পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় কিংবা প্রাকৃতিক পরিবেশ ধ্বংস হয়ে যায় তাতে তাদের কিছু আছে যায় না। বরং তারা তাদের কার্যক্রমে যা কিছু প্রতিবন্ধক তার সবকিছু নিশ্চিহ্ন করে ফেলতে উদ্যত হয়। নাইজেরিয়ায় কেবলমাত্র ওগোনি সংখ্যালঘু জাতির আন্দোলনকে দমনের জন্য শেল কোম্পানি একটি নিজস্ব পুলিশ বাহিনী গঠন করে। বহুজাতিক কোম্পানিগুলোর তেল গ্যাস সংক্রান্ত তৎপরতার

৬ পাতায় দেখুন

বহুজাতিক তেল-গ্যাস কোম্পানি: নাইজেরিয়া ও ইকুয়েডরের ক্ষুদ্র জাতিসত্তাসমূহের অভিজ্ঞতা এবং আমাদের শিক্ষা

৫ পাতার পর

ফলে যদি স্থানীয় জনগণের উন্নয়ন হতো তাহলে নাইজেরিয়া ও ইকুয়েডরের সংখ্যালঘু জাতিসত্তাসমূহের বর্তমানের এই দুর্দশা হতো না। শুধু সংখ্যালঘু জাতির জনগণ কেন, নাইজেরিয়ার মতো তেল গ্যাস সম্পদে সমৃদ্ধ দেশের জনগণের অবস্থারও প্রকৃত অর্থে কোন উন্নতি হয়নি। নাইজেরিয়া আফ্রিকায় সর্ববৃহৎ এবং অর্গানাইজেশন অব পেট্রোলিয়াম এক্সপোর্টিং কাউন্ট্রিজ বা ওপেক এর মধ্যে পঞ্চম বৃহৎ তেল উৎপাদনকারী দেশ। অথচ তা সত্বেও এই দেশটি পৃথিবীর দরিদ্রতম দেশগুলোর মধ্যে একটি। দুর্নীতিতে বাংলাদেশ প্রথম হওয়ার আগে নাইজেরিয়া ছিল সবার শীর্ষে। আর বর্তমানে বাংলাদেশের পরেই তার স্থান। মুদ্রাস্ফীতি আকাশচুম্বী। সেখানে জনগণের জীবনযাত্রার মান এমন পর্যায়ে নেমে গেছে যে একজন কলেজের শিক্ষক এক মাসে যা বেতন পান তা দিয়ে সে কেবল এক সপ্তাহ চলতে পারে। সম্প্রতি ডেইলি স্টার পত্রিকায় (১২ ফেব্রুয়ারি ২০০২) আফসান চৌধুরী নাইজেরিয়ার উপর একটি লেখা লিখেছেন। সেখানে তিনি লেখেন, গত বছর তারা একটি প্রাইভেট ট্যাক্সিতে করে ইজলিংটন থেকে হিথরো এয়ারপোর্টে যাচ্ছিলেন। ড্রাইভারটি ছিলেন একজন নাইজেরিয়ান। তিনি আইএমএফ এর পলিসি, অর্থ ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি সম্পর্কে কথা বলতে বলতে এক সময় জানান, "I used to teach economics at the college but my salary took care of me for only a week. So now I am a cabbie in London." *অর্থাৎ আমি কলেজে অর্থনীতি পড়াতাম। কিন্তু আমার বেতনের টাকা দিয়ে আমি কেবল এক সপ্তাহ চলতে পারতাম। সেজন্য আমি এখন লন্ডনে ট্যাক্সি চালাচ্ছি।*

সুতরাং কোন দেশে বা অঞ্চলে সম্পদ থাকলেই যে জনগণের উন্নয়ন হবে তার কোন গ্যারান্টি নেই। এক্ষেত্রে দেখতে হবে এই সম্পদ ও উৎপাদনের উপায় সমূহের উপর কার নিয়ন্ত্রণ রয়েছে। জনগণের প্রকৃত উন্নয়ন তখনই সম্ভব যখন এই সকল সম্পদ ও উৎপাদনের উপায় সমূহের ওপর জনগণের মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয়। এই নিয়ন্ত্রণ না থাকার জন্যই নাইজেরিয়া ও ইকুয়েডরের জনগণের আজকের এই করুণ পরিণতি।

তেল গ্যাস কোম্পানিগুলো সাধারণত এলাকার স্থানীয় জনগণের মধ্য থেকে একটি সুবিধাবাদী গোষ্ঠি সৃষ্টি করে ও তাদেরকে হাত করে নেয়, যাতে তাদের লুণ্ঠনের কার্যক্রমে কেউ বাধা সৃষ্টি করতে না পারে, বা বাধা আসলে এই বশংবদ গোষ্ঠিকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে তা মোকাবিলা করতে পারে। এই সুবিধাবাদী গোষ্ঠিকে - যাদের মধ্যে রাজনৈতিক দলের নেতারাও থাকতে পারেন - লুণ্ঠিত সম্পদের উচ্ছিষ্ট দিয়ে তেল গ্যাস কোম্পানিগুলো বাকি সম্পদ পাচার করে নিয়ে যায়। আর লুণ্ঠনের এই প্রক্রিয়ায় বলি হতে হয় সাধারণ জনগণকে। সাধারণ চোর বা ডাকাত কোন বাড়ি থেকে ধন সম্পদ নিয়ে গেলে ঐ বাড়ির গৃহস্থের অন্তত একটা সান্তনা থাকে যে, ঐ চোর বা ডাকাত তার ধন সম্পদ চুরি করে নিয়ে গেলেও বাড়ির লোকজনকে প্রাণে বধ করে যায়নি; বেঁচে থাকলে আবার ধন সম্পদ উপার্জন করা যাবে। কিন্তু এই তেল গ্যাস কোম্পানিগুলো চোর ডাকাতের চেয়েও ভয়াবহ। তারা ধন সম্পদ তো চুরি করে নিয়ে যাবেই, তার উপর স্থানীয় সংখ্যালঘু জাতিসত্তা এবং সমগ্র পরিবেশকে ধ্বংস করে দিয়ে যাবে।

সেজন্য পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণকে অবশ্যই এ সম্পর্কে সচেতন এবং নিজেদের সম্পদ রক্ষার জন্য সচেষ্ট হতে হবে। বহুজাতিক তেল গ্যাস কোম্পানিগুলো জোঁকের মতো জেকে বসার আগেই প্রতিবাদ ও প্রতিরোধে সোচ্চার হতে হবে। তা না হলে নিজেদের সম্পদই নিজেদের কাল হয়ে দাঁড়াতে পারে। যেমনটা ইকুয়েডর ও নাইজেরিয়ার সংখ্যালঘু জাতিসত্তাসমূহের ক্ষেত্রে হয়েছে।

[মূলতঃ হিউম্যান রাইটস ওয়াচ-এর রিপোর্ট ও এডভোকেসি প্রজেক্ট-এর "অন দ্যা রেকর্ড" নামে রিপোর্ট সিরিজসহ ইন্টারনেট থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে এই নিবন্ধটি রচনা করা হয়েছে।]

আন্তর্জাতিক কার্যক্রম

জাপানে জুম্ম পিপল্‌স নেটওয়ার্ক এর কার্যক্রম

॥ টোকিও, জাপান থেকে চিচিক্কো চাকমা ॥

জুম্ম পিপল্‌স নেটওয়ার্ক - জাপান ২০০১ সালের নভেম্বর মাসে জাপানের আরো নতুন দু'টি এলাকায় তাদের কার্যক্রম সম্প্রসারিত করেছে। অধিক সংখ্যক জাপানি জনগণের মধ্যে পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যাকে তুলে ধরার জন্য জুম্ম পিপল্‌স নেটওয়ার্ক-জাপান নিত্য নতুন এলাকায় গিয়ে নতুন সংগঠন ও লোকজনের সাথে মিলিত হচ্ছে, তাদের সাথে মত বিনিময় করছে ও পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা-পরিস্থিতির কথা তুলে ধরছে।

ইবারাকী সমাবেশে বক্তব্য রাখছেন জুম্ম পিপল্‌স নেটওয়ার্কের চিচিক্কো চাকমা। তার বাম পাশে উপবিষ্ট সোনারাম চাকমা।

গত নভেম্বর মাসের ১১ তারিখ টোকিওর পার্শ্ববর্তী চিবা জেলা শহর ও ২৩ তারিখ দূরবর্তী ইবারাকী জেলা শহরে জুম্ম পিপল্‌স নেটওয়ার্ক-জাপান সফর করে এবং সেখানে লোকজনের কাছে পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যার কথা তুলে ধরে। উভয় জায়গায় প্রধান আয়োজক হলেন সিভিক এ্যাকশন নামক একটি বেসরকারী সংস্থা, যা মূলত পরিবেশ, মানবাধিকার ও সামাজিক-রাজনৈতিক বিষয় নিয়ে কাজ করে থাকে। সিভিক এ্যাকশন পার্বত্য চট্টগ্রামের মানবাধিকার ও পরিবেশগত সমস্যার ওপর বিশেষভাবে আলোকপাত করে জুম্ম পিপল্‌স নেটওয়ার্কের সাথে একযোগে কাজ করে যাওয়ার জন্য অঙ্গীকারাবদ্ধ।

চিবা সমাবেশ

চিবা শহরটি টোকিও থেকে প্রায় ২০ কিলোমিটার দূরে টোকিও উপসাগরের তীরে অবস্থিত। জনসংখ্যা প্রায় দশ লাখ। ১১ নভেম্বরের এক রৌদ্রকরোজ্জ্বল দিনে জুম্ম পিপল্‌স নেটওয়ার্কের প্রতিনিধিরা সেখানে গিয়ে উপস্থিত হন। তাদেরকে স্বাগত জানানোর জন্য অপেক্ষা করছিলেন জনা তিরিশেক বিভিন্ন বয়সের নরনারী। এরা সবাই সিভিক এ্যাকশনের সাথে জড়িত এবং তারা পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্মদের ব্যাপারে জানতে উদগ্রীব। বেলা ২টার দিকে সিভিক এ্যাকশন প্রধান এবং জুম্মনেট-এর একজন সদস্য ওসাদা'র পরিচালনায় প্রধান অনুষ্ঠান শুরু হয়। শুরুতেই পার্বত্য চট্টগ্রামের ওপর নির্মিত একটি ডক্যুমেন্টারি ফিল্ম প্রদর্শিত হয়। এরপর মি. ওসাদা এবং জুম্মনেটের নতুন সম্ভাবনাময়ী সদস্য মি. কেনজি কুনো পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বর্ণনা করেন। তারপর জুম্মনেটের সভাপতি ও সম্পাদক যথাক্রমে চিচিক্কো চাকমা ও সোনারাম চাকমা পার্বত্য চট্টগ্রামে কিভাবে জাতিগত নিধন প্রক্রিয়া চালানো হচ্ছে তা তাদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার আলোকে উপস্থিত সমবেতদের কাছে বর্ণনা করেন।

সমাবেশে চিচিক্কো চাকমা বলেন, জুম্মদের এতই দুর্ভাগ্য যে তারা জনসংখ্যার দিক দিয়ে খুব অল্প হলেও পার্বত্য চট্টগ্রাম পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বেশী সামরিকীকৃত অঞ্চলে পরিণত হয়েছে, যেখানে জুম্ম জনসংখ্যা ও সামরিক বাহিনীর অনুপাত ৫:১। পৃথিবীর আর কোথাও এ রকম অবস্থা দেখা যায়নি বলে তিনি মন্তব্য করেন। তার এই বক্তব্যে সমাগতদের মধ্যে অনেকের গা শিউরে ওঠে এবং অনেকেই বিস্ময় প্রকাশ করেন।

সোনারাম চাকমা বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামে আমাদের চলাফেরার কোন স্বাধীনতা নেই। কয়েক বছর আগেও সর্বক্ষেত্রে সামরিক বাহিনীর অনুমতি নিতে হতো। প্রতি মাইল পর পর রাস্তার পাশে রয়েছে আর্মিদের চেকপোষ্ট। সেখানে জুম্মদের অনেক হয়রানিমূলক জিজ্ঞাসাবাদ, আটক ও পরে খুন করা হয়। সেখানে জীবনের কোন নিরাপত্তা নেই। ১৯৯৭ সালে তথাকথিত শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হলেও এই অবস্থা এখনো বলবৎ রয়েছে।

এরপর শুরু হয় অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্ব। প্রশ্নোত্তর পর্ব। উপস্থিত শ্রোতাদের মধ্য থেকে প্রশ্ন করা হয় এবং জুম্ম পিপল্‌স নেটওয়ার্কের সদস্যদের তার উত্তর দিতে হয়। জুম্মরা কেন জাপানে প্রচার কাজ চালাচ্ছেন ও জাপানীদের কাছে কি আশা করেন এ প্রশ্নের জবাবে চিচিক্কো চাকমা বলেন, জাপান হল অর্থনৈতিক দিক দিয়ে এশিয়ায় প্রথম ও বিশ্বে দ্বিতীয় শক্তিধর দেশ। বাংলাদেশের মতো একটি দরিদ্র দেশকে প্রধানত জাপানের আর্থিক সাহায্যের ওপর নির্ভর করে চলতে হয়। কিন্তু বাংলাদেশ সরকার জাপান থেকে প্রাপ্ত আর্থিক সাহায্যের একাংশ পার্বত্য চট্টগ্রামে জুম্মদের নিধন কাজে ব্যবহার করে থাকে। সেজন্য জাপানী জনগণের উচিত এ ব্যাপারে তাদের সরকারের কাছে বিষয়টি তুলে ধরে এর প্রতিবাদ করা। কিন্তু অধিকাংশ জাপানীই বিষয়টি সম্পর্কে অবহিত নয় বলেই গণসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে জাপানে জুম্ম পিপল্‌স নেটওয়ার্কের প্রচার কাজ চালানো হচ্ছে। তিনি আরো বলেন, "আমরা চাই সবার আগে জাপানী জনগণ জুম্ম সমস্যা সম্পর্কে অবগত হোক, যাতে তারা জাপান সরকারের কাছে চাপ প্রয়োগ করতে পারেন যেন তাদের প্রদত্ত সাহায্য জুম্মদের মানবাধিকার হরণের জন্য ব্যবহৃত না হয়।" শেষে সেইদিনের সমাবেশের আয়োজনে সন্তুষ্টি প্রকাশ করে ও ভবিষ্যতে জুম্মদের পাশে এসে দাঁড়াবার প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

ইবারাকী সমাবেশ

এরপর ২৩শে নভেম্বর টোকিও থেকে ১০০ কিলোমিটার উত্তরে অবস্থিত জেলাশহর ইবারাকীতে জুম্ম পিপল্‌স নেটওয়ার্কের সফর অনুষ্ঠিত হয়। ইবারাকী বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গনে সিভিক এ্যাকশন এক সমাবেশের আয়োজন করে। সেখানে উপস্থিত হন প্রায় চল্লিশ জনের মতো নরনারী, যারা পার্বত্য চট্টগ্রাম কিংবা জুম্ম জনগণ সম্পর্কে মোটেই অবহিত নন। এখানে বক্তব্য রাখেন জুম্ম নেটের উপদেষ্টা প্রফেসর কাজুমি মাজানে, যিনি বিগত দশ বছর ধরে পার্বত্য চট্টগ্রামের ওপর কাজ করে যাচ্ছেন। এছাড়া বক্তব্য রাখেন জুম্মনেটের সভাপতি চিচিক্কো চাকমা, সম্পাদক সোনারাম চাকমা ও কেনজি কুনো। প্রফেসর মাজানে তার সুদীর্ঘ বক্তৃতায় ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার আলোকে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যাকে তুলে ধরে বলেন, প্রত্যেক বছর জাপান সরকার বাংলাদেশকে আর্থিক সাহায্য প্রদান করে কার্যত সেখানকার জাতিগত সংখ্যালঘু জুম্মদের নিধনকাজে নিয়োজিত, যা মানবাধিকারের গুরুতর লঙ্ঘন। জাপানী জনগণের উচিত তার প্রতিবাদ করার জন্য সংগঠিত হওয়া ও জাপান সরকারকে চাপ দেয়া। তিনি এ ব্যাপারে এগিয়ে আসার জন্য উপস্থিত সমবেতদের প্রতি আহ্বান জানান।

সমাবেশের এক পর্যায়ে সকলের সামনে জুম্মদের ঐতিহ্যের প্রতীক "পিনোন" ও "খাদি" প্রদর্শন করা হয় এবং জুম্মদের সংস্কৃতির বিভিন্ন দিক সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। উপস্থিত উৎসাহী জাপানীরা জুম্মদের নিজস্ব রান্না সম্পর্কে গভীর আগ্রহ ব্যক্ত করেন এবং জুম্ম খাবার পরিবেশনের জন্য জুম্ম পিপল্‌স নেটওয়ার্কের নেতাদের অনুরোধ জানান। পরবর্তী "বিজু"তে তাদের অনুরোধ রক্ষা করার প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়।

সাংস্কৃতিক কার্যক্রম:

সম্প্রতি জাপানে বাংলাদেশ বিষয়ক সর্ববৃহৎ ও খ্যাতনামা এনজিও "শাপলানীর"-এর উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল বাংলাদেশী ক্ষুদ্রজাতিসত্তাসমূহের হাতের তৈরী প্রথাগত বস্ত্রের দুই দিন ব্যাপী প্রদর্শনী অনুষ্ঠান। পৃথিবীর ব্যয়বহুলতম ও টোকিওর অত্যন্ত জাঁকজমকপূর্ণ ও "এলিটনগরী" বলে পরিচিত "জিনজা" অঞ্চলে অনুষ্ঠিত এই প্রদর্শনীতে বাংলাদেশের হস্তশিল্প এবং টেক্সটাইলের পাশাপাশি গারো, মনিপুরী, রাখাইনসহ পার্বত্য চট্টগ্রামের জাতিসত্তাসমূহের ঐতিহ্যবাহী পরিধেয় বস্ত্র প্রদর্শন করা হয়। এতদিন ধরে শাপলানীরের উদ্যোগে জাপানে বাংলাদেশের মূল জনগোষ্ঠির সমাজ, সংস্কৃতি ও হস্তশিল্পের প্রদর্শনী হয়ে আসলেও এই প্রথমবারের মত ও ব্যাপকভিত্তিতে বাংলাদেশের অন্তর্গত অন্যান্য ক্ষুদ্র জাতিসত্তাসমূহের ঐতিহ্যবাহী হস্তশিল্পও উপস্থাপনের উদ্যোগ হাতে নেয়া হলো। এটি নিঃসন্দেহে সংখ্যালঘু জাতিসত্তাসমূহের জন্য একটি সুখবর বলা যেতে পারে। কেননা, মূল জনগোষ্ঠির সাংস্কৃতিক আগ্রাসনে সংখ্যালঘু জাতিসত্তাসমূহের নিজস্ব সংস্কৃতি যেখানে ক্রমান্বয়ে নিশ্চিহ্ন হতে চলেছে সেখানে এ ধরনের উদ্যোগ আন্তর্জাতিকভাবে একটি প্রতিরোধমূলক প্রবনতা সৃষ্টি করতে সহায়তা করবে।

জাপানে জুম্মদের সংগঠন "জুম্ম পিপল্‌স নেটওয়ার্ক - জাপান" এই প্রদর্শনীতে একটি সহযোগি সংগঠন হিসেবে যোগদান করতে পেরে অত্যন্ত গর্ববোধ করে এবং যোগদানের সুযোগ প্রদানের জন্য সংগঠককে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানায়।

প্রদর্শনীতে চাকমা, রাখাইন, গারো ও মুনিপুরীদের ঐতিহ্যবাহী পরিধেয় বস্ত্রগুলো সর্বাধিক গুরুত্ব পায়। এছাড়াও পার্বত্যাঞ্চলের তঞ্চঙ্গ্যা, ত্রিপুরা, বম ও ম্রোদের পরিধেয় বস্ত্রও উপস্থাপন করা হয়। চাকমাদের ধর্মীয় ও দৈনন্দিন জীবনযাত্রার উপর নির্মিত একটি প্রামান্য ভিডিও চিত্রও প্রদর্শন করা হয়। চাকমাদের পরিধেয় বস্ত্র "পিনোন" কিভাবে পরিধান করতে হয় তা উপস্থিত দর্শকদের সামনে শিখিয়ে দেয়া হয়। এ কাজে জুম্ম পিপল্‌স নেটওয়ার্কের সদস্যরা আন্তরিকভাবে সহযোগিতা করেন। পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্মদের জীবনযাত্রা সম্পর্কে দর্শকদের বিভিন্ন অনুসন্ধানী প্রশ্নেরও উত্তর তারা প্রদান করেন।

সমাগত দর্শকদের অনেকেই পার্বত্য চট্টগ্রামের স্বাতন্ত্র্যমন্ডিত সংস্কৃতির প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করেন এবং ভবিষ্যতে ঐ অঞ্চলের ওপর সাংস্কৃতিক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করার আশা প্রকাশ করেন। বিশেষ করে সংখ্যালঘু জাতিসত্তাসমূহের তৈরি হস্তশিল্প, পরিধেয় বস্ত্র ইত্যাদি সংরক্ষণ এবং মানোন্নয়নে অবদান রাখার ব্যাপারে বিশেষ আগ্রহ ব্যক্ত করেন।

অপরদিকে বহিঃসংস্কৃতির আগ্রাসনে এইসব বৈচিত্র্যময় সংস্কৃতির ক্রম অবলুপ্তির বিষয়টি তারা অনুধাবন করেন এবং এ ব্যাপারে তারা গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেন। সংখ্যালঘু জাতিসত্তাসমূহের ঐতিহ্যমন্ডিত সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রাখতে এগিয়ে আসার ওপর তারা গুরুত্ব আরোপ করেন। ❐

সেনা সন্ত্রাস

কাউখালি-ঘাগড়ায় সেনা অপারেশন

১৪ জুলাই ২০০১ হামিদ টিলা আর্মি ক্যাম্প থেকে একদল সেনা সদস্য কলা বনিয়া নামক গ্রামে "অপারেশনে" যায়। এ সময় গ্রামবাসীদের মধ্যে আতংক ছড়িয়ে পড়ে।

১৭ জুলাই হুদুকছড়ি আর্মি ক্যাম্পের হাবিলদার তাহের এর নেতৃত্বে একদল সেনা সদস্য হাজাছড়ি, বটতলী ও মোনপাড়া গ্রামে "অপারেশন" চালায়। তারা গ্রামবাসীদেরক অহেতুক নানান জিজ্ঞাসবাদ করে। এলাকায় বার বার সেনা অপারেশনের ফলে বর্তমানে জনমনে আতংক বিরাজ করছে।

১৩ আগষ্ট চম্পাতলি ক্যাম্প থেকে এক দল সেনা সদস্য লেবাপাড়া, বাদলছড়ি, নোয়া আদাম, চেলছড়া, জুনুমাছড়া ইত্যাদি গ্রামে তাদের ভাষায় ব্যাপক তল্লাশী অভিযান পরিচালনা করে। সাধারণ জুমিয়া প্রজারা এই অভিযানে নানাভাবে হয়রানির শিকার হন।

সেনাসদস্যরা বাদল ছড়ি গ্রামের তুষার কান্তি চাকমা (৩৫) পিতা সূর্য্যসেন চাকমাকে কোন কারণ ছাড়াই বেদম মারধর করে। নোয়া আদামের অপর এক ব্যক্তিকেও সেনারা মারধর করে বলে জানা গেছে। তবে তার নাম তৎক্ষণাৎ সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি।

১৮ আগষ্ট উত্তর হুদুকছড়ি আবাসিক ও পুদিখালি গ্রামে ব্যাপক সেনা অভিযান চলে। সেনারা লোকজনকে হয়রানি করে ও ইউপিডিএফ কর্মিদের সম্পর্কে নানা জিজ্ঞাসাবাদ করে। একইদিন সেনারা ভুইয়ো আদাম ও লাঙেল পাড়ায়ও তল্লাশী চালায়। এছাড়া লংগুদু, কাট্টলী, নান্যাচরের বিভিন্ন গ্রামে বাড়ি বাড়ি সেনারা তল্লাশী চালাচ্ছে। তারা কি বা কাকে খোঁজ করে তা কেউ বলতে পারে না, তবে এতে সাধারণ লোকজন গণহারে হয়রানির শিকার হচ্ছেন।

সেনাবাহিনী ও সন্তু চক্রের সন্ত্রাসীদের যৌথ হামলা

স্বাধিকার রিপোর্ট ॥ গত ২৯ মে ২০০১ মঙ্গল বার সকাল সাড়ে সাতটার সময় বুড়িঘাট আর্মি ক্যাম্পের কমান্ডারের নেতৃত্বে একদল আর্মি ও সন্তু চক্রের সন্ত্রাসীরা হাতিমারায় এক যৌথ হামলা চালায়। তারা গ্রামবাসীদের লক্ষ্য করে গুলি চালায়। তবে এতে কেউ হতাহত হয়নি বলে জানা গেছে।

আর্মিদের সাথে এই যৌথ হামলায় অংশ নেয়া জেএসএস সন্ত্রাসীরা হলো চিছ-অ চাকমা, বিপল চাকমা, দুলাল চাকমা, অনন্ত চাকমা। এরা প্রতিদিন সেনা সদস্যদের নাকের ডগায় বুড়িঘাট বাজারে চাঁদাবাজি করে থাকে। রহস্যজনক কারণে পুলিশও তাদের এই অপকর্মে নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করে।

এরপর আবার ৩ জুন ২০০১ বুড়িঘাট ক্যাম্পের ৩৪ জন সেনা সদস্য ও উপরোল্লখিত সন্তু চক্রের সন্ত্রাসীরা মিলে পুটিখালী ভুইয়ো আদাম পাড়ায় হানা দেয়। তারা রাত আনুমানিক ১টার দিকে দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে ভাগ্যচন্দ্র বাড়ীর পাহাড়ে ও কিয়াং ঘরের (বৌদ্ধ মন্দির) পাহাড়ে এমবুশ করে। এ সময় সন্তু চক্রের সন্ত্রাসীরা সেনাবাহিনীর পোষাক পরিহিত ছিল। সেনাবাহিনী তাদের হাতে ৩০৩ রাইফেলও তুলে দেয়। তারা সকাল আটটার দিকে এমবুশের স্থান ত্যাগ করে গ্রামে যায় এবং লোকজনকে হয়রানিমূলক জিজ্ঞাসাবাদ করে। পরে তারা ২টি বোট নিয়ে বুড়িঘাট ক্যাম্পে ফিরে যায়।

১৮ জুলাই বুধবার বুড়িঘাট ক্যাম্পের সেনা জোয়ানরা তৃতীয় বারের মতো পুটিখালী নীচ পাড়া দোকানে সন্তু চক্রের সন্ত্রাসী চিছ চাকমা ও অনন্ত চাকমার সহযোগিতায় এমবুশ করে। তারা ইউপিডিএফ-এর সদস্যদের ধরার জন্য ওঁত পেতে বসে থাকে বলে জানা যায়।

গ্রাম্য সালিশে আর্মিদের হস্তক্ষেপ: যুবতি মেয়ে অপহরণের চেষ্টা

স্বাধিকার রিপোর্ট ॥ ২৪শে আগষ্ট ২০০১ রাঙ্গামাটি জেলার নান্যাচর জোনের সেনা সদস্যরা গভীর রাতে বড়পুল পাড়া গ্রামের অমৃত লাল চাকমার বাড়িতে হানা দিয়ে সেখান থেকে সোনারিকা চাকমা নামে এক যুবতি মেয়েকে অপহরণের চেষ্টা চালায়।গ্রামের লোকজন বাধা দিলে আর্মিদের অপহরণ চেষ্টা ব্যর্থ হয়।

জানা যায়, বড়পুল পাড়া গ্রামের সোনারিকা চাকমা (২০) পিতা সলিল কুমার চাকমা ও কমলা রঞ্জন চাকমা (২৫) পিতা ললিত কুমার চাকমাকে কেন্দ্র করে গ্রামে সালিশ হওয়ার কথা ছিল। সেজন্য সোনারিকা চাকমাকে সালিশ নিস্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত অমৃত লাল চাকমার বাড়িতে তার হেফাজতে রাখা হয়। কিন্তু এদিকে কমলা রঞ্জন চাকমা লোকজনের অজান্তে নান্যাচর আর্মি জোনে আশ্রয় নেয় এবং সব ঘটনা খুলে বলে। এক পর্যায়ে সেনাবাহিনী উছিলা পেয়ে গভীর রাতে সোনারিকা চাকমাকে অপহরণ করতে যায়। তারা সোনারিকা চাকম্যাকে বাড়ি থেকে টেনে হিঁচড়ে বের করে নিয়ে আসে ও তাদের সাথে ক্যাম্পে যাওয়ার জন্য চাপ প্রয়োগ করে। সোনারিকা চিৎকার জুড়ে দিলে পাড়ার লোকজন ছুটে এসে আর্মিদের বাধা প্রদান করে। সেনারা তাকে অপহরণ করতে ব্যর্থ হলে এক পর্যায়ে বড়পুল পাড়া দোকান ঘর ও শান্তি জীবন চাকমার বাড়ি থেকে লোক ধরে নিয়ে এসে তাদেরকে সন্ত্রাসী আখ্যায়িত করে অমানুষিকভাবে মারধর করতে থাকে। যারা সেনাবাহিনীর এই নির্যাতনের শিকার হন তারা হলেন, সোনাতন চাকমা (১৮) পিতা কালুক্ষ্যা চাকমা, জ্যোতি বিকাশ চাকমা (১৪) পিতা কৃষ্ণ হরি কার্বারী ও স্নেহ কুমার চাকমা (১৫) পিতা দীন লাল চাকমা। এদের মধ্যে জ্যোতি বিকাশ চাকমা নান্যাচর উচ্চ বিদ্যালয়ের নবম শ্রেণীর ছাত্র, আর স্নেহ কুমার চাকমা অমৃত লাল চাকমার বাড়িতে সাহায্যকারী হিসেবে কাজ করে। সেনারা প্রথম দুই ব্যক্তিকে ধরে নিয়ে যায়। তবে হাত পা বাঁধা অবস্থায় অর্ধেক রাস্তায় তাদেরকে ছেড়ে দেয়।

নান্যাচরে ১৮ মাইল ক্যাম্পের সুবেদারের অত্যাচারে জনগণ অতিষ্ঠ

স্বাধিকার রিপোর্ট ॥ রাঙ্গামাটি জেলার নান্যাচরে আটারো মাইল ক্যাম্প। সেখানে কমান্ডার হিসেবে থাকেন একজন সুবেদার। তার নাম জানা যায়নি। তবে তার অত্যাচারে এলাকার সাধারণ জনগণ এখন চরম অতিষ্ঠ। নীচে তার কীর্তিকলাপের কিছু বর্ণনা দেয়া হল।

আর্মিদের হাতে বাবা ও মেয়ে প্রহৃত

২০শে আগষ্ট রাঙ্গামাটি জেলার নান্যাচর জোনের ১৮ মাইল আর্মি ক্যাম্পের (৮ম বেঙ্গল) একদল সেনা সদস্য সোনারাম কার্বারী পাড়ায় গিয়ে একই পরিবারের ২ সদস্যকে বেদম মারধর করে।

সকাল পৌনি নয়টার দিকে নান্যাচরে সোনারাম কার্বারী পাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক হেমন্ত মাস্টার (৬৫) স্কুলে যাওয়ার জন্য রওনা হচ্ছিলেন। এমন সময় একজন সুবেদারের নেতৃত্বে ১০ জন্য সেনা সদস্যের একটি দল তার বাড়ির উঠোনে এসে হাজির হয়। উক্ত সুবেদার কোন কথা নেই বার্তা নেই মাস্টারের সামনে একটি বন্দুক উঁচিয়ে জিজ্ঞেস করে তিনি সেটা কি চেনেন কিনা। উত্তরে মাস্টার সাহেব চেনেন বললে সুবেদারটি আবার জিজ্ঞেস করেন "কি?" উত্তরে বন্দুক বললে সঙ্গে সঙ্গে সুবেদার নিজে ও অপর ২ জন সেনা সদস্য তার ওপর চড়াও হয়। কিল ঘুষি লাঠি চলতে থাকে। তার চিৎকার শুনে বাড়ির ভেতর থেকে তার মেয়ে নমিতা চাকমা (২৮) বেরিয়ে আসেন এবং তার বাবাকে বিনা কারণে এভাবে না মারার জন্য কাকুতি মিনতি করতে থাকেন। কিন্তু আর্মিরা উল্টো তাকেও মারধর করে। পরে সুবেদার সাহেব হেমন্ত মাস্টারের কাছ থেকে স্কুলের চাবিগুচ্ছ কেড়ে নিয়ে ক্যাম্পে চলে যায়।

সুবেদারের ভয়ে স্কুলে যেতে পারছে না প্রদীপ কুমার চাকমা

বেতছড়ি জে: ওসমানী উচ্চ বিদ্যালয়ের ৭ম শ্রেণীর ছাত্র প্রদীপ কুমার চাকমা পিতা আশাপূর্ণ চাকমা। বর্তমানে সে ১৮ মাইল ক্যাম্পের সুবেদারের কারণে স্কুলে যেতে পারছে না। তাকে আর্মিদের অত্যাচারের ভয়ে পালিয়ে থাকতে হচ্ছে।

ঘটনাটি ঘটে এভাবে। ২০শে আগষ্ট সে নিত্য দিনের মতো স্কুলে যাচ্ছিল। তার নিজ বাড়ি সোনারাম কার্বারী পাড়া থেকে কিছুদূর যাওয়ার পর সে খেয়াল করে যে তার কলমটি হারিয়েছে। তাই সে কলমটি খুঁজতে ফিরে আসতে থাকে। এমন সময় উক্ত সুবেদারের নেতৃত্বে একদল সেনা সদস্য সোনারাম কার্বারী পাড়ায় আসছিল যা সে খেয়াল করেনি। কিন্তু আর্মিরা তার ফিরে আসাটাকে লক্ষ্য করে। উক্ত সুবেদারের সন্দেহ ও অভিযোগ প্রদীপ চাকমা আর্মিদের আসার খবর সন্ত্রাসীদের দেয়ার জন্য ফিরছিল। তাই তারা এখন তাকে ও তার বাবাকে খোঁজ করছে। স্কুলে যাওয়ার সময় হলে আর্মিরা পথে ওঁৎ পেতে থাকে। ফলে ভয়ে প্রদীপ ও তার বাবা এখন ঘর ছাড়া। সে স্কুলে যেতে পারছে না। তার সম্ভাবনাময় ভবিষ্যত তিলে তিলে নষ্ট হয়ে যেতে বসেছে উক্ত সুবেদারের কারণে। প্রদীপকে খোঁজার অজুহাতে তাদের বাড়ি সেনারা ঘেরাও করে ও বাড়ির মেয়েদের ধর্ষণের চেষ্টা চালায়। নীচে আলাদাভাবে তার উল্লেখ করা হল।

ধর্ষণের চেষ্টা ব্যর্থ হলে মারধর

২২শে আগষ্ট সকাল পৌনে নয়টার দিকে ১৮ মাইল ক্যাম্পের সুবেদারের নেতৃত্বে ১১ সদস্যের একটি সেনা দল আবার সোনারাম কার্বারী পাড়ায় হানা দেয় ও গ্রামের দু'টি বাড়ি ঘেরাও করে। ঐ সময় বাড়ির পুরুষ সদস্যরা সবাই জুমের কাজে ক্ষেতে গিয়েছিলেন। সেনারা তল্লাশীর নামে বাড়িতে ঢুকে পড়ে। বাড়িতে পুরুষ কাউকে দেখতে না পেয়ে সুবেদার কালাবি চাকমা (১৮) পিতা ইন্দু বিকাশ চাকমা-কে বাড়ির ভেতরে টেনে নিয়ে ধর্ষণের চেষ্টা চালায়। অপরদিকে অন্য দুই জন আর্মি সদস্য নিপা চাকমা (১৪) পিতা হৃদয় রঞ্জন চাকমা ও ছাপতি চাকমা (৩২) পিতা আশাপূর্ণ চাকমাকে ধর্ষণের চেষ্টা চালায়। এ সময় মেয়েরা ভয়ে কান্নাকাটি ও চিৎকার জুড়ে দেয়। নিপার ভাই নয় বছরের বালক পূর্ণ বিকাশ চাকমা বোনের ইজ্জত বাঁচাতে এক আর্মির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। মেয়েরাও ইজ্জত রক্ষার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা চালায়। ফলে আর্মিদের ধর্ষণের অপচেষ্টা ব্যর্থ হয়। এরপর আর্মিরা ব্যর্থতার প্রতিশোধ নিতে ঐ মেয়েদের ওপর নির্বিচারে শারীরিক নির্যাতন চালায়। সেনারা কালাবি চাকমার হাতের আঙুল একেবারে পিষ্ট করে দেয়।

১৮ মাইল ক্যাম্পের উক্ত সুবেদারের অত্যাচারে এলাকার লোকজন চরমভাবে অতিষ্ঠ। লোকজনকে বিনা কারণে মারধর করা ছাড়াও সে গ্রামবাসীদের কাছ থেকে প্রায় সময় বিনামূল্যে বা অর্ধেক মূল্যে মুরগী ফলমূল নিয়ে যায়। কেউ কিছু বলার বা প্রতিবাদ করার সাহস পায় না। ক্যাম্পের পাশ দিয়ে যেতেও লোকের ভয়। কারণ সব সময় ক্যাম্পে ডেকে জিজ্ঞাসাবাদের নামে লোকজনকে হয়রানি করা হয়। তার এই উৎপাত ও অত্যাচার থেকে কিভাবে পরিত্রাণ পাওয়া যাবে তা এলাকাবাসী জানেন না। স্বাধিকারের মাধ্যমে যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে তাদের দাবি ১৮ মাইল ক্যাম্পটি অচিরেই তুলে নেয়া হোক।

গভীর রাতে নান্যাচড়ে সেনা তল্লাশী: শ্লীলতাহানির চেষ্টা

স্বাধিকার রিপোর্ট॥ গত ১৫ ফেব্রুয়ারি গভীর রাতে নান্যাচরের জোন কমান্ডার লে: ক: রফিকুল ইসলামের নির্দেশে একদল সেনাসদস্য রাঙ্গামাটি জেলার নান্যাচরের বড়পুল পাড়ায় হামলা চালায়। ১৩ তারিখ নিখোঁজ হওয়া ৮ ব্যবসায়ীকে খোঁজার নাম করে সেনারা এই অভিযান পরিচালনা করে।

এ সময় তারা গ্রামের লোকজনকে ঘুম থেকে জাগিয়ে তোলে এবং অহেতুক জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে। সেনারা ৪ জুম্ম নারীর শ্লীলতাহানির চেষ্টা চালায় বলে গ্রামবাসীরা জানিয়েছেন। এরা হলেন, রিক্তা চাকমা (২৮) স্বামী বিমল চাকমা, অনিকা দেবী চাকমা (২৮) স্বামী সবিনয় চাকমা, পূর্ণশোভা চাকমা (৩০) স্বামী কৃষ্ণ বরণ চাকমা ও চম্পাবতি চাকমা (৩০) স্বামী কৃষ্ণ বরণ চাকমা।

ঘটনার পরদিন স্থানীয় মুরুব্বী প্রভাত চন্দ্র হেডম্যান সেনাসদস্যদের যৌন হয়রানির বিবরণ দেন একজন দায়িত্বরত সুবেদারের কাছে। তিনি জোন কমান্ডারের নিকটও একই বিবরণ দেবেন বলে জানালে উক্ত সুবেদার তাকে না বলার জন্য চাপ দেন। তিনি বিষয়টি ধামাচাপা দেবার জন্য উক্ত হেডম্যানকে অনুরোধ করেন। ফলে সেনা সদস্যদের যৌন হয়রানির বিষয়টির সেখানেই যবনিকাপাত ঘটে। এভাবে সেনাসদস্যরা অপরাধ করেও কোন শাস্তি হয় না বলে এক্কের পর এক শ্লীলতাহানির ঘটনা ঘটে থাকে। পার্বত্য চট্টগ্রামে জুম্ম নারীরা বিশেষত দূরবর্তী পাড়াগ্রামগুলোতে সব সময়ই সেনাবাহিনীর যৌন সন্ত্রাসের আতংকে দিন কাটাতে বাধ্য হয়। ঘরের বাইরে কাজে যাওয়া তাদের জন্য আরো বেশী বিপজ্জনক। পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে যতক্ষণ পর্যন্ত সেনাবাহিনী প্রত্যাহার করা হবে না ততদিন তাদেরকে এভাবে ভয়ানক পরিস্থিতিতে দিন কাটাতে হবে। যে অঞ্চলে জাতিগত নিপীড়নের জন্য সেনা মোতায়েন করা হয় সেখানে সেনা বাহিনীর শারীরিক উপস্থিতিই নারীদের জন্য হুমকিমূলক। কাজেই পার্বত্য চট্টগ্রামে এ অবস্থা আর চলতে পারে না। সেখান থেকে সেনাবাহিনী প্রত্যাহার ছাড়া জুম্ম জনগণের সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিত হতে পারে না।

মহালছড়িতে সেনা ও সন্তু চক্রের যৌথ হামলা, ১ জন ইউপিডিএফ কর্মি নিহত

স্বাধিকার রিপোর্ট ॥ গত ৩০ শে জুলাই ২০০১ মহালছড়ির বদানালায় ইউপিডিএফ-এর জনসভা চলার সময় সেনাবাহিনী ও সন্তু চক্র যৌথভাবে আক্রমণ চালায়। সেনাসদস্যরা নির্বিচারে গুলি চালালে এতে সজল ত্রিপুরা নামে ইউপিডিএফ-এর একজন কর্মি ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারায় ও অপর দুই জন গুরুতর আহত হয়। আহতদেরকে সেনাসদস্যরা নিয়ে যায়।

নান্যাচরে সেনা অপারেশন: নিরীহ ব্যক্তি নির্যাতনের শিকার

স্বাধিকার রিপোর্ট ॥ রাঙ্গামাটি জেলার নান্যাচর জোনের জোন কমান্ডারের নেতৃত্বে একটি সেনা দল গত ১৯ ফেব্রুয়ারি লাম্বাছড়া ও মরাচেঙ্গী গ্রামে হামলা চালায়। এ সময় সেনাদের নির্মম শারীরিক নির্যাতনের শিকার হয় ১৫ জন নিরীহ জুম্ম। এরা হলেন লাম্বাছড়া গ্রামের লাজুক্যা চাকমা (৩২) পিতা বিনতা লাল চাকমা, নবেন চাকমা (১৮) পিতা জওহর লাল চাকমা, দেব শংকর চাকমা (৩২) পিতা সুবিলাস চন্দ্র চাকমা, চোক্ষবো চাকমা (৩২) পিতা ধনঞ্জয় চাকমা, দত্ত চাকমা (৩০) পিতা হরিলক্ষ্য চাকমা, জ্ঞানজ্যোতি চাকমা পিতা জওহর লাল চাকমা, প্রিয়ময় চাকমা (১৭) পিতা অমৃত লাল চাকমা, বিমল চন্দ্র চাকমা (৩২) পিতা দয়ানন্দ চাকমা ও কৃষ্ণ দত্ত চাকমা (২৪) পিতা হরিলক্ষ্য চাকমা। মরাচেঙ্গী গ্রামে যারা নির্যাতনের শিকার হন তারা হলেন, মিতু চাকমা (১৭) পিতা সুশীল কুমার চাকমা, তরণ কান্তি চাকমা (৩৮) পিতা নয়ন সুখ চাকমা, সুশীল কুমার চাকমা পিতা মৃত রতন সুখ চাকমা, চন্দ্র শেখর চাকমা (২৩) পিতা বিমল কান্তি চাকমা, শান্তি জীবন চাকমা পিতা ধীরেন্দ্র লাল চাকমা। এছাড়া যৌথ খামারের মনি চাকমা (৩০) পিতা নিরোদ রঞ্জন চাকমাও সেনা সদস্যদের নির্যাতনের শিকার হন।

গুইমারায় সেনাবাহিনী কর্তৃক এক ব্যক্তি প্রহৃত, গ্রেফতার

স্বাধিকার রিপোর্ট॥ সুরেন্দ্র চাকমা গুইমারায় পরশুরাম ঘাট পাড়ার এক গ্রাম্য চা দোকানে বসে অন্যান্যদের সাথে আপন মনে আড্ডা দিচ্ছিলেন। এমন সময় ডজন খানেক সেনা সদস্য হঠাৎ সেখানে এসে উপস্থিত হয়। তারা দোকানে অবস্থানরত লোকজনের কাছ থেকে সন্ত্রাসী দেখেছে কিনা জিজ্ঞেস করে। দেখেনি বলে উত্তর দিলে সেনারা সুরেন্দ্র চাকমাকে মারধর করতে ধরে নিয়ে যায়। পরে তাকে মারধর করার পর গুইমারা থানা পুলিশের নিকট সোপর্দ করা হয়। তার বিরুদ্ধে পুলিশ বাংলাদেশ দণ্ড বিধির ৩৬৪ ধারায় মামলা দায়ের করে। বর্তমানে তাকে খাগড়াছড়ি জেল হাজতে পাঠানো হয়েছে। সুরেন্দ্র চাকমার বয়স ৩০। পিতার নাম লতি মোহন চাকমা গ্রাম পরশুরাম ঘাট।

গুইমারায় সেনাবাহিনী কর্তৃক ৩ ব্যক্তি গ্রেফতার

স্বাধিকার রিপোর্ট॥ গত ৫ জানুয়ারি ২০০২ সন্ত্রাসী ধরার নামে খাগড়াছড়ি জেলাধীন গুইমারার হাতিমারা ক্যাম্পের এক ডজন সেনা সদস্য বাল্যাছড়ি ভক্ত কার্বারী পাড়ায় হানা দেয়। তাদের সাথে ছিল একটি দেশী গাদা বন্দুক।

সেনারা গ্রামে কোন সন্ত্রাসীকে না পেয়ে তিন নিরীহ ব্যক্তিকে ধরে নিয়ে যায়। এরা হলেন, প্রতুল্যা চাকমা (৫৫) পিতা মৃত জয় মোহন চাকমা, কমলা মোহন চাকমা (৩৫) পিতা মৃত রবীন্দ্র চাকমা ও জয়ন্ত ত্রিপুরা (৩০) পিতা বরেন্দ্র ত্রিপুরা। সেনারা পরে তাদেরকে গুইমারা থানা পুলিশের নিকট সোপর্দ করে। তাদের বিরুদ্ধে বাংলাদেশ দণ্ডবিধির ৩৬৪ ধারায় মামলা দায়ের করা হয়েছে (মামলা নং ১, তাং ৫/১/০২)। তাদেরকে বর্তমানে খাগড়াছড়ি জেল হাজতে পাঠানো হয়েছে।

সেনা হামলার সময় প্রতুল্যা চাকমা জমির কাজ ছেড়ে বাড়ি ফিরছিলেন, কমলা মোহন বাড়িতে অবস্থান করছিলেন এবং জয়ন্ত ত্রিপুরা বাড়ির কাজ করছিলেন।

এরপর উক্ত ক্যাম্পের সেনা সদস্যরা আবার ২০ জানুয়ারি ভোর রাতে ভক্ত কার্বারী পাড়ায় প্রতুল্যা চাকমার বাড়িতে ঢুকে বাড়ির দরজা জানালা ভেঙে দেয় ও জিনিসপত্র তছনছ করে দেয়। গ্রেফতারকৃতদের পরিবারবর্গ এখন অনাহারে অর্ধাহারে দিনাতিপাত করছে।

শেষ পাতা

মাটিরাঙ্গায় সন্তু সন্ত্রাসের প্রতিবাদে গণমিছিল

স্বাধিকার রিপোর্ট॥ জাতীয় বেঈমান সন্তু লারমা চক্রের ভ্রাতৃঘাতি ও জাতিবিধ্বংসী সশস্ত্র তৎপরতার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে উঠছেন পার্বত্য চট্টগ্রামের সর্বস্তরের জনগণ। তার সন্ত্রাসী কর্মকান্ডের বিরুদ্ধে গণপ্রতিবাদ ও গণপ্রতিরোধ অব্যাহত রয়েছে।

গত ২৩ জানুয়ারি ২০০২ মাটিরাঙ্গা সদরে হাজার হাজার নরনারী স্বতঃস্ফূর্তভাবে জেএসএস-এর সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে এক প্রতিবাদ মিছিল বের করে। সন্তু সন্ত্রাসীদের একের পর এক সন্ত্রাসী কাজে অতিষ্ঠ হয়ে মাটিরাঙ্গা ও গুইমারা এলাকার লোকজন নিজেরাই সংগঠিত হয়ে এই প্রতিবাদে সামিল হতে বাধ্য হয়। মিছিলটি বাল্যাছড়ি থেকে শুরু হয়ে মাটিরাঙ্গা টিএনও অফিসের সামনে এসে শেষ হয়। অতপর সেখানে এক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। হিরেন্দ্র চাকমার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন প্রফুল্ল মারমা, চাচিমং মারমা প্রমুখ। বক্তারা চুক্তির পর থেকে সন্তু সন্ত্রাসীদের খুন, অপহরণসহ বিভিন্ন সন্ত্রাসী অপকর্মের তীব্র সমালোচনা করেন এবং সম্প্রতি অপহৃত অংছা ডাক্তারের আশু মুক্তির দাবি জানান। এলাকায় সন্তু সন্ত্রাসীদের বিভিন্ন অপকর্ম তুলে ধরে টিএনও-এর মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী বরাবরে একটি স্মারকলিপিও পেশ করা হয়।

উল্লেখ্য, কুখ্যাত সন্তু সন্ত্রাসী হাসেন্ত ডাক্তার ওরফে অনুপমের নেতৃত্বে একদল সন্ত্রাসী ৩রা জানুয়ারি কালাম ড্রইভার ও ১৭ জানুয়ারি বাল্যাছড়ির অংছা ডাক্তারকে অস্ত্রের মুখে অপহরণ করে নিয়ে যায়। পরে কালাম ড্রইভারকে মুক্তিপণের বিনিময়ে ছেড়ে দেয়া হলেও অংছা ডাক্তারকে সন্ত্রাসীরা ছেড়ে দেয়নি। তার ভাগ্যে কি ঘটেছে তাও জানা যায়নি।

অংছা মারমার পারিবারিক সূত্র জানায়, ১৭ জানুয়ারি রাতে ৭/৮ জন সশস্ত্র সন্ত্রাসী বাড়িতে এসে অংছা ডাক্তারকে ডেকে নিয়ে যায়। তারা সন্ত্রাসীদের মধ্য থেকে হাসেন্তকে সনাক্ত করতে সক্ষম হয়। অনেক খোঁজাখুঁজির পরও অংছা মারমার কোন সন্ধান মেলেনি। অপহরণের খবর ছড়িয়ে পড়লে এলাকার লোকজন জেএসএস-এর ওপর ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। দীর্ঘদিন ধরে তারা সন্তু লারমার মদদপুষ্ঠ সন্ত্রাসীদের উৎপাত ও অত্যাচারে অতিষ্ঠ। ভিতরে ভিতরে তারা ক্ষোভে বিক্ষোভে জ্বলছিল। শেষ পর্যন্ত এই বিক্ষোভেরই বিষ্ফোরণ ঘটে অংছা মারমার অপহরণ ঘটনার পর।

এলাকাবাসীরা জানান, তারা আর সন্তু সন্ত্রাসীদের অত্যাচার নির্যাতন সহ্য করতে রাজী নয়। তারা এবার থেকে সংঘবদ্ধ হয়ে তাদেরকে মোকাবিলা করবেন। সন্তু লারমার সমালোচনা করে তারা বলেন, সন্তু লারমা ডাবল অপরাধ করেছেন। প্রথমত তিনি জনগণের ঘাম ও রক্তের বিনিময়ে অর্জিত আন্দোলনকে সরকারের কাছে বন্ধক দিয়েছেন। দ্বিতীয়ত তিনি আত্মসমর্পনের পর নিজের গদি ঠিক রাখার জন্য সরকারের পক্ষ হয়ে জুম্ম জনগণের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরেছেন। এজন্য তার অবশ্যই শাস্তি হওয়া উচিত বলে তারা মনে করেন।

হিল উইমেন্স ফেডারেশনের আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালন

স্বাধিকার রিপোর্ট॥ ৮ই মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস। বাংলাদেশসহ সারা বিশ্বে এ দিবসটি পালন করা হয়। হিল উইমেন্স ফেডারেশনও প্রতি বছরের মতো এবারও আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালন করেছে। এ উপলক্ষে ঢাকা ও চট্টগ্রামে র‍্যালী ও সমাবেশের আয়োজন করা হয়েছে।

ঢাকা

সকাল ১০টায় টিএসটি থেকে মিছিল শুরু হয় এবং জাতীয় প্রেস ক্লাবে গিয়ে শেষ হয়। সেখানে হিল উইমেন্স ফেডারেশন এক সমাবেশের আয়োজন করে। সংগঠনের ঢাকা শাখার সহসভানেত্রী সুপ্তা চাকমার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন সহসাধারণ সম্পাদক সূচনা চাকমা, পিসিপি ঢাকা শাখার সাধারণ সম্পাদক দীপংকর ত্রিপুরা, পিসিপি ঢাকা শাখার সভাপতি মিঠুন চাকমা, এইচডব্লিউএফ-এর সাধারণ সম্পাদক ইলিরা দেওয়ান ও এইচডব্লিউএফ-এর প্রাক্তন সভানেত্রী কবিতা চাকমা।

বক্তারা বলেন, দেশে নারী নির্যাতন ও এসিড সন্ত্রাস আশংকাজনক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। পত্রিকার পাতা খুললেই প্রতিদিন অসংখ্য নারী নির্যাতনের খবর পাওয়া যাচ্ছে। পার্বত্য চট্টগ্রামও এর ব্যতিক্রম নয়। সেখানেও নারী নির্যাতন আগের মতোই অব্যাহত আছে। কিন্তু সেসব ঘটনা পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয় না বললেই চলে।

নেতৃবৃন্দ মনে করেন, শিমু, ইয়াসমীন, তানিয়া, ফাহিমাদের নির্যাতনকারী ও খুনীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হয় না বলেই এবং রাষ্ট্র নির্যাতনকারীদের রক্ষা করে বলেই দেশে নারী নির্যাতনের ঘটনা এত ব্যাপক আকার ধারণ করেছে। তারা বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামে যতদিন সেনাবাহিনী থাকবে ততদিন জুম্ম নারীরা নিরাপদে ও স্বস্তিতে থাকতে পারবেন না। সেনাবাহিনীর শারীরিক অবস্থানই সেখানে নারীদের জন্য হুমকিমূলক। কল্পনা চাকমার অপহরণ এই সত্যকেই তুলে ধরে।

বক্তারা পার্বত্য চট্টগ্রামসহ সারা দেশে নারী নির্যাতনকারীদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার আহ্বান জানান ও অচিরেই কল্পনা চাকমার অপহরণ তদন্ত রিপোর্ট প্রকাশের দাবি জানান।

চট্টগ্রাম

হিল উইমেন্স ফেডারেশন ক্ষেন্দ্রীয় কমিটির উদ্যোগে বন্দর নগরী চট্টগ্রামে এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার থেকে র‍্যালীটি শুরু হয় এবং নগরীর গুরুত্বপূর্ণ সড়ক প্রদক্ষিণ করে। এরপর আবার ক্ষেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন হিল উইমেন্স ফেডারেশনের সভানেত্রী সমারী চাকমা। বক্তব্য রাখেন সংগঠনের কেন্দ্রীয় দপ্তর সম্পাদক অন্তরিকা চাকমা, পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের সভাপতি মিল্টন চাকমা ও ইউপিডিএফ-এর প্রতিনিধি অপু চাকমা। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন সোনালী চাকমা।

অন্তরিকা চাকমা তার স্বাগত বক্তব্যে বলেন, যুগ যুগ ধরে পাহাড়ি নারীরা নিগৃহীত ও নির্যাতিত হয়ে আসছে। পুরুষতান্ত্রিক অধস্তনতার সাথে জাতিগত নিপীড়ন যোগ হয়ে পাহাড়ি নারীদের অবস্থা আরো বেশী সঙ্গীন হয়ে পড়েছে। তিনি বলেন পূর্ণস্বায়ত্তশাসন ছাড়া পাহাড়ে নারীদের মুক্তি সম্ভব নয়।

পিসিপি'র কেন্দ্রীয় সভাপতি মিল্টন চাকমা তার বক্তব্যে বলেন, পুরুষদেরকে অতীতের ঘুনেধরা সামন্তবাদী ও পুরুষতান্ত্রিক চিন্তাধারা থেকে মুক্ত হয়ে বেরিয়ে আসতে হবে। নারীদেরকে কেবল নারী হিসেবে নয়, মানুষ হিসেবে গণ্য করতে হবে ও যথাযোগ্য মর্যাদা দিতে হবে। নারী মুক্তি আন্দোলন কেবল নারীদের আন্দোলন নয়, এটা নারী পুরুষ উভয়ের আন্দোলন।

ইউপিডিএফ-এর প্রতিনিধি অপু চাকমা বলেন, একটি সমাজ কতদূর উন্নত হয়েছে তা বোঝা যায় সে সমাজে নারীদের কতটুকু মর্যাদা দেয়া হয়েছে তা থেকে। একটি জাতি, সমাজ ও দেশকে এগিয়ে নিতে হলে নারী স্বাধীনতা একটি জরুরী প্রশ্ন। তিনি বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামে স্বায়ত্তশাসন আন্দোলনের ক্ষেত্রে নারীদের অংশগ্রহণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সমাজের জনসংখ্যার অর্ধেক নারীদের পিছনে ফেলে রেখে কোন আন্দোলন এগিয়ে যেতে বা জোরদার হতে পারে না। তিনি পাহাড়ি নারীদেরকে নিজের তথা জাতিসত্তার ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য আন্দোলনে জোরদার ভূমিকা রাখার আহ্বান জানান।

সভাপতির ভাষণে সমারী চাকমা বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামের নারীরা বিভিন্নভাবে নির্যাতন ও নিপীড়নের শিকার। ব্যাপক সামরিকায়ন ও সরকারের এথনিক ক্লিনজিং পলিসির কারণে সেখানে পাহাড়ি নারী ও শিশুরা সবচেয়ে বেশী নিগৃহীত ও অত্যাচারিত হয়। কল্পনা চাকমার অপহরণ তার একটি জাজ্বল্য দৃষ্টান্ত। দেশের দু' দুটি সরকার পরিবর্তিত হওয়ার পরও কল্পনা চাকমা অপহরণ তদন্ত রিপোর্ট প্রকাশ করা হয়নি। সরকারের পক্ষ থেকে কল্পনা চাকমার ব্যাপারে ভয়ানক নীরবতা পালন করা হচ্ছে। তিনি আর বিলম্ব না করে কল্পনা চাকমা অপহরণ তদন্ত রিপোর্ট প্রকাশসহ এযাবত সংঘটিত সকল নারী নির্যাতনের ঘটনা তদন্ত করে দোষী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তি প্রদানের দাবি জানান।

সমারী চাকমা তার বক্তব্যে পার্বত্য চট্টগ্রামে নারী বৈষম্যের চিত্র তুলে ধরেন এবং বিস্ময় প্রকাশ করে বলেন, দেশের ৬১টি জেলার জন্য জাতীয় সংসদে ৬১ জন মহিলা আসন সংরক্ষণের আইন পাশ হয়, অথচ পার্বত্য চট্টগ্রামে তিনটি আসনের জন্য মাত্র একটি আসন বরাদ্দ করা হয়। এটা চরম বৈষম্যমূলক ও সংবিধান পরিপন্থী। দেশের শাসক শোষক গোষ্ঠি পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণকে কি পরিমাণ অবহেলা ও উপেক্ষার চোখে দেখে থাকে এটা তারই একটি নমূনা। তিনি তিন পার্বত্য জেলার জন্য তিনটি আসন সংরক্ষণের দাবি জানান। তিনি দেশের অন্যান্য এলাকায় নারীদের ওপর এসিড নিক্ষেপ, গার্মেন্টস শ্রমিকদের ওপর নির্যাতন, ইয়াসমিন, সীমা, তানিয়াসহ সাম্প্রতিক সময়ে মহিমা, ফাহিমা ও সিমিদের ওপর পাশবিক নির্যাতনের প্রতিবাদ ও নিন্দা জানান এবং এসব ঘটনায় জড়িত অপরাধীদের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদানের দাবি জানান।

পার্বত্য চট্টগ্রামে তেল-গ্যাস অনুসন্ধান ও উত্তোলন কার্যক্রম স্থগিতের দাবিতে ঢাকায় মিছিল

স্বাধিকার রিপোর্ট॥ পার্বত্য চট্টগ্রামে জনগণের নায্য দাবি পূরণের মাধ্যমে প্রকৃত শান্তি প্রতিষ্ঠা না হওয়া পর্যন্ত তেল গ্যাস অনুসন্ধান ও উত্তোলন কার্যক্রম স্থগিত রাখার দাবিতে ঢাকায় এক বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশের আয়োজন করা হয়। গত ১লা ফেব্রুয়ারি পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ ও হিল উইমেন্স ফেডারেশন যৌথভাবে এর আয়োজন করে।

মিছিলটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসি থেকে শুরু হয়ে জাতীয় প্রেস ক্লাবে গিয়ে শেষ হয়। এরপর সেখানে অনুষ্ঠিত সমাবেশ বক্তব্য রাখেন পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের সাধারণ সম্পাদক প্রমেশ্বর চাকমা, হিল উইমেন্স ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক ইলিরা দেওয়ান, সুপ্তা চাকমা, দীপংকর ত্রিপুরা ও রূপন চাকমা।

সমাবেশে বক্তারা বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামের তেল ও গ্যাস সম্পদ লুণ্ঠনের প্রক্রিয়া চলছে। এজন্য দেশী বিদেশী একটি চক্র তৎপর রয়েছে। ওসান এনার্জি নামে একটি মার্কিন তেল কোম্পানি অচিরেই কূপ খনন করবে বলে পত্রিকায় খবর প্রকাশিত হয়েছে। বক্তারা হুঁশিয়ার করে দিয়ে বলেন, "পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণকে বঞ্চিত করে সেখানকার তেল গ্যাস সম্পদ উত্তোলন করা যাবে না। আগে অধিকার দিতে হবে, তারপর তেল গ্যাস দেবো। না হলে যে কোন মূল্যে তেল গ্যাস উত্তোলন কার্যক্রম প্রতিহত করা হবে।" পিসিপি ও এইচডব্লিউএফ-এর নেতৃবৃন্দ আরো বলেন, অসাধু কাঠ ব্যবসায়ী ও সরকারী বন কর্মকর্তাদের দুর্নীতির কারণে বর্তমানে পার্বত্য চট্টগ্রাম বৃক্ষশুন্য হয়ে পড়ছে। প্রাকৃতিক ভারসাম্য বিনষ্ট হচ্ছে। তেল গ্যাস সম্পদ উত্তোলনের কারণে সেখানে প্রাকৃতিক পরিবেশ চরম বিপর্যয়ের সম্মুখীন হবে। এমনকি স্থানীয় পাহাড়ি জনগণের নিজেদের জায়গা জমি থেকে উচ্ছেদ হওয়ারও সম্ভাবনা থাকবে। সে কারণে বর্তমান অশান্ত পরিস্থিতিতে পার্বত্য চট্টগ্রামে তেল গ্যাস অনুসন্ধান ও উত্তোলন কার্যক্রম স্থগিত রাখার কোন বিকল্প নেই। বক্তারা অচিরেই ওসান এনার্জির পার্বত্য চট্টগ্রামে তেল গ্যাস সম্পর্কিত সকল কার্যক্রম স্থগিত করে দেয়ার জন্য সরকারের কাছে জোর দাবি জানান। একই সাথে মার্কিন কোম্পানি ইউনাইটেড মেরিডিয়ানের সাথে সম্পাদিত পিএসসি বাতিলেরও তারা দাবি জানান।

পার্বত্য চট্টগ্রামে জাতিসত্তার মাতৃভাষা স্বীকৃতির দাবিতে চট্টগ্রামে মিছিল ও সমাবেশ

স্বাধিকার রিপোর্ট॥ গত ২১ ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষ্যে পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ চট্টগ্রাম মহানগর শাখার উদ্যোগে চট্টগ্রামে এক মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। শহীদ মিনার থেকে শুরু হয়ে মিছিলটি প্রেস ক্লাবে গিয়ে শেষ হয়। এরপর সেখানে এক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। পিসিপি মহানগর শাখার সভাপতি সোনালী চাকমা এতে সভাপতিত্ব করেন। এছাড়া বক্তব্য রাখেন পিসিপি মহানগর কমিটির সাধারণ সম্পাদক বিপ্লব চাকমা, সাংগঠনিক সম্পাদক অলকেশ চাকমা, স্বর্ণজ্যোতি চাকমা, দীপংকর ত্রিপুরা, এইচডব্লিউএফ-এর সভানেত্রী সমারী চাকমা, গারো জাতিসত্তার ছাত্র প্রতিনিধি জবিনাথ দিও ও ইউপিডিএফ-এর চট্টগ্রাম ইউনিটের সদস্য অপু চাকমা।

বক্তারা পার্বত্য চট্টগ্রামে সংখ্যালঘু জাতিসত্তাসমূহের নিজস্ব ভাষায় প্রাইমারী লেভেল পর্যন্ত শিক্ষাদানের দাবি জানান।

সভাপতির ভাষণে সোনালী চাকমা বলেন, যে উচ্ছ্বাস নিয়ে বাঙালী জনগণ আজ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন করছেন, দেশের সংখ্যালঘু জাতিসত্তার প্রতিনিধি হিসেবে আমাদের পক্ষে সে উচ্ছ্বাসের অংশীদার হওয়া সম্ভব হচ্ছে না। বাংলাদেশের জনগণের গৌরব ২১ ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষার স্বীকৃতি লাভ করলেও, দুঃখজনক ব্যাপার হচ্ছে, পার্বত্য চট্টগ্রাম সহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বসবাসরত বাঙালী ছাড়া অন্যান্য জাতিগোষ্ঠিসমূহের মাতৃভাষা এখনো অবহেলিত অবস্থায় পড়ে রয়েছে। এই ভাষাসমূহের রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নয়নের জন্য কোন রাষ্ট্রীয় নীতিমালা ও পৃষ্ঠপোষকতা নেই। দেশে যেমন এইসব জাতিগোষ্ঠিসমূহের কোন স্বীকৃতি নেই, ঠিক তেমনি তাদের মাতৃভাষারও কোন সরকারী স্বীকৃতি আজ পর্যন্ত মেলেনি। এটা বাংলাদেশের জন্য অত্যন্ত লজ্জাজনক ব্যাপার।

তিনি সংখ্যালঘু জাতিসত্তাসমূহের মাতৃভাষায় শিক্ষার অধিকারের দাবি জানান এবং এ ব্যাপারে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানান। এর আগে পিসিপি মহানগর কমিটির পক্ষ থেকে চট্টগ্রাম শহীদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পন করা হয়। এছাড়া পিসিপি ঢাকা শাখা ঢাকার কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শাখা বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পন করে।

ভুল সংশোধন

স্বাধিকারের ১৮ নং বুলেটিনে শেষ পৃষ্ঠায় "সন্তু চক্রের সন্ত্রাসীরা বন্দুক ভাঙায় ৬ জনকে অপহরণ করেছে" শিরোনামে একটি রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছিল। সেখানে ঘটনার বিবরণ সম্পূর্ণ সত্য হলেও অপহৃতদের নাম ভুল ছাপা হয়েছিল। অপহৃতদের সঠিক নাম হবে মিহির লাল চাকমা (২৫) পিতা মৃত যাত্রা মোহন চাকমা, সিন্ধু মনি চাকমা (৩২) পিতা কান্দর সিং চাকমা, জলক্ষ চাকমা (২৭) পিতা পূণ্যধন চাকমা, বিজয় চন্দ্র চাকমা (৩৫) পিতা অজ্ঞাত, প্যারী মোহন চাকমা (৫০) পিতা চাদো বাপ ও বারণী চাকমা (৫২) পিতা অজ্ঞাত। এরা সবাই রাঙ্গামাটি জেলাধীন বন্দুক ভাঙা এলাকায় ত্রিপুরা ছড়া গ্রামের বাসিন্দা।

উক্ত ভুলের জন্য আমরা আন্তরিকভাবে দুঃখিত।

ইউনাইটেড পিপলস ডেমোক্রেটিক ফন্ট (ইউপিডিএফ) -এর প্রচার ও প্রকাশনা বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত ও প্রচারিত। সম্পাদকীয় যোগাযোগ: ৩৮৮ পূর্ব বাড়ী, জগন্নাথ হল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা